৪২বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
টিউশনির বাজার	সুনন্দ সান্যাল	৩
দশাবতার-ভাষ্য (১)	জোতীরাও ফুলে অনু: আশীষ লাহিড়ী	৫
কালিনাথ রায়	নিরঞ্জন হালদার	৮
ওষুধ খাওয়া	ইন্দ্রনীল ঠাকুর	১২
বার্ধক্য	গৌতম মিস্ত্রী	১৫
জলঙ্গী নদী	অলোককুমার বিশ্বাস	১৮
কোন রাস্তা নেব	সুদেষ্ণা ঘোষ	২০
আলোর দূষণ	নন্দগোপাল পাত্র	২২
মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য	শ্রীতন্বী চক্রবর্তী	২৩
লিঙ্গ রাজনীতি	রূপক বর্ধন রায়	২৬
ক্লোনড্ পত্রিকা	মোনালিসা মুস্তাফি	৩০
চিঠিপত্র		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

গত ২২ মার্চ প্রয়াত হন শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সুনন্দ সান্যাল (১৯৩৪-২০২২)। উৎস মানুষ পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। ওঁর বেশ কয়েকটি মূল্যবান লেখা বেরিয়েছিল পত্রিকায়। প্রয়াতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 'প্রাইভেট টিউশনি' লেখাটি এই সংখ্যায় বেছে নেওয়া হল। সুনন্দবাবুর লেখাটি কুড়ি বছর পরেও গুরুত্ব হারায় নি। যে কোনো সামাজিক অন্যায় নিয়ে সুনন্দবাবু প্রতিবাদে সোচ্চার হতেন। এরজন্য ওঁকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। নির্ভীক এই শিক্ষককে আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

খবরে প্রকাশ দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্যে প্রাথমিক ক্লাস থেকে গীতা পড়ানোর নির্দেশ জারি হয়েছে। আমাদের মতো দেশে যেখানে নানান ধর্মের মানুষ বাস করেন সেখানে একটি বিশেষ ধর্মীয় পুস্তক এভাবে চালু করা হলে বহু মানুষের ক্ষোভ বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে মানুষকে সচিতন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ যে কোনো সংস্থা, গোষ্ঠীর কাছে এই সিদ্ধান্ত চরম বিপদসংকেত! নতুন শিক্ষানীতিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে অঙ্ক আর পদার্থবিদ্যা না জানলেও চলবে — এমন সব উদ্ভট প্রস্তাব এখন বিবেচনার পর্যায়ে। চালু হতে কতক্ষণ?

অতিমারীর প্রকোপ খানিকটা কমেছে। স্কুল,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আবার ছাত্রছাত্রীদের কলতানে মুখরিত হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা।

২২ মার্চ ছিল বিশ্ব জল দিবস। ১৯৯৩ থেকে দিনটি পালিত হয়ে আসছে। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার, জলভাণ্ডার নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য আদানপ্রদান ও জল নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোই এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য। সারা বিশ্বে আনুমানিক ২২০ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ জল পান না। আমাদের দেশে শহরে ও গ্রামে ঘরে ঘরে যে জল ব্যবহার করা হয় তার ৮০ ভাগই ভূগর্ভস্থ জল। ঘটনা হল এই জলস্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। নদী-নালা-খাল-বিল-পুকুর বুজিয়ে আমরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি। শহর ও শহরতলিতে হু হু করে ফ্ল্যাট হচ্ছে। যেখানে একটা বাড়িতে একটা কি দুটো পরিবার থাকত, এখন সেখানে কম করেও আট-দশটা পরিবার থাকছে। মাটির তলার জল তোলা হচ্ছে বিপুল

হারে। এটাও বড় সমস্যা। মাটির তলার জল তোলায় ক্লোরিন ও আর্সেনিক ছড়াচ্ছে ব্যাপক হারে। কোনো সতর্কতা শুনছি না। অপচয় বন্ধ করার প্রক্রিয়া বেশ ঢিলে-ঢালা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে দেখা যাবে — এই হঠকারি মনোভাব নিয়ে বিপদকে আটকানো যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলা গত ২৩-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানকার ব্যবস্থাপনাও বেশ ভাল ছিল। আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তার ঠিক পরেই ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মার্চ বিধাননগর করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কে ৪৫তম আন্তর্জাতিক বইমেলা হয়ে গেল। প্রতিবারের মতো এই মেলায় উৎস মানুষ স্টল দিয়েছিল। খুব যে বিক্রি হয়েছে তা নয়, তবে একেবারে খারাপ হয়েছে তাও নয়। বইমেলায় উৎস মানুষ সংকলন *আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি* প্রকাশিত হয়। আমাদের প্রিয় লেখক আশীষ লাহিড়ীর ১৫ পর্বের ধারাবাহিকটির সংকলন পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এবারের বইমেলার স্টলে আমরা কালনা কাটোয়া তারকেশ্বর ফুলিয়ার বেশ কিছু চেনামুখ দেখতে পাই নি। স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারাও সেভাবে স্টলে ভিড় করেছিলেন তেমনও নয়। যানবাহন কম, মাধ্যমিক পরীক্ষা, করোনা পরিস্থিতি এসবই হয়ত কারণ!

ফ্যাসিবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক উদ্যোগ ও লিটল ম্যাগাজিনের সমন্বয় মঞ্চ আয়োজিত সারা বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের মেলা গত ২৪-২৬ মার্চ কলকাতার কলেজ স্কেয়ারে অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় উৎস মানুষ অংশ নেয়। ছোট জায়গায় প্রায় ৭০টি লিটল ম্যাগাজিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে সাংস্কৃতিক মঞ্চে গান, নাটক, কবিতা পাঠ মেলার আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়।

— পরিচালকমণ্ডলী

উমা

উৎস মানুষ পত্রিকার পুরনো পাতা থেকে
(জানুয়ারী, ১৯৮০)

কেমন ছিল সংখ্যাগুলি? তারই কিছু নমুনা তুলে ধরা হবে মূলত নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। প্রথম বছরে (১৯৮০) প্রতিমাসে একটি করে বার্ষিক বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হত, পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা থাকত ১৮ ও বিনিময় মূল্য ০.৭৫ টাকা। প্রথম বছরে পত্রিকা **মানুষ** শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে পত্রিকা 'উৎস মানুষ' নামকরণ করা হয়।

প্রথম সংখ্যার (জানুয়ারী, ১৯৮০) প্রথম সম্পাদকীয়র কিছু অংশ:

''...নতুন দশকের নতুন বছরের নতুন মাসের নতুন দিনে আমাদের পথচলা শুরু। যাত্রাপথ সেই বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র জুড়ে যেখানে প্রকৃতির বুকে মানুষে গড়া সমাজে প্রতিনিয়ত চলছে বেঁচে থাকার লড়াই — সেই রণক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান পত্রিকাকে হাতিয়ার করে সৈনিকের ভূমিকায় আমাদের অনুপ্রবেশ।...

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এক একটা আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্র তৈরি করে। সমাজ নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীই শাসন-শোষণের স্বার্থে কুসংস্কার, ভাগ্য আর দৈবনির্ভরতাকে নানাকৌশলে জিইয়ে রাখে। আর এরই জন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যক্তিত্ব আত্মবিশ্বাস আর অন্যান্য গুণাবলী সুস্থভাবে গড়ে ওঠে না, জন্ম নেয় সংকীর্ণতা দুর্বলতা বিদ্বেষ আর অসংহতি। ... অন্তর্লীন ভয়ঙ্কর রোগসংক্রমণের বিরুদ্ধে তাই ব্যাপক বিজ্ঞান-আন্দোলন প্রয়োজন যা মানুষের সুপ্ত চেতনাকে সজাগ করবে। এ এক যুদ্ধ। অতি দুরূহ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। ব্রতসাধনার সূচনার কাজে গণ্ডূষ প্রমাণ কর্মপ্রচেষ্টারও মূল্য আছে, তাই আমরা পথে নামার ভরসা পাই। জীবন ক্রমশঃ জটিলতর হচ্ছে। সেখানে প্রাত্যহিক জীবনে জড়ানো বিজ্ঞানের ন্যূনতম জ্ঞান আর একটা পরিচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই শুধু বেঁচে থাকাকে সহজ এবং সুস্থ করতে পারে — এই বিশ্বাস নিয়ে নতুন দশকের নতুন বছরের নতুন মাসের নতুন দিনে আমাদের পথ চলা শুরু।''

শেষ পাতায় শালগ্রাম শিলার ছবি — নিবন্ধ ভেতরের পাতায়

টিউশনির বাজার

সুনন্দ সান্যাল

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাইভেট টিউশনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তবু টিউশনির সামাজিক প্রয়োজন ফুরোয় নি— বোধ করি সহজে ফুরোবেও না। মন্ত্রী মশায়দের টিউশনির বিরুদ্ধে হুংকার নিরর্থক — তাতে আন্তরিকতা নেই।

ক্লাসরুমে সেরা মাঝারি ও নিম্নমানের ছাত্রদের সবার উপযুক্ত করে পঠনপাঠনের নানা কৌশল দেশে-বিদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু এ রাজ্যে ৯০ শতাংশ বা তদধিক স্কুলে সে সব অত্যাধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের কোনও সুযোগ নেই। আমাদের রাজ্যে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন; তা ক্লাসরুমে অপ্রযুক্ত থেকে যাওয়ার ইতিহাসও সমান প্রাচীন। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা সাধ্যমতো ভাল করে পড়াতে চান তাঁদেরও বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখেই পড়াতে হয়। তাই ক্লাসের পড়া প্রধানত সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদেরই উপযুক্ত হয়।

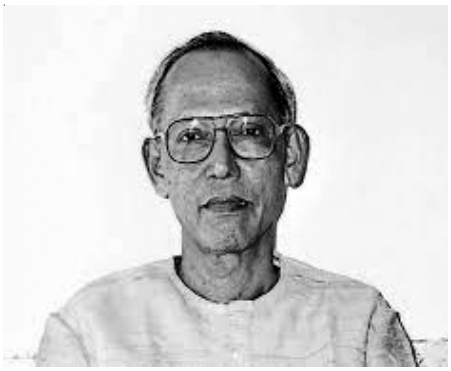

ফলে সেই পড়া সেরা ও নিম্নমানের ছেলেমেয়েদের চাহিদা মেটাতে পারে না। টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারলে অবশ্য সব ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্যই কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু স্কুলে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা কোনও কালেই ভাল ছিল না, এখন তো তার প্রশ্নই ওঠে না। ফলে আগের মতো এখনও সেরা ও নিম্নমানের ছাত্রদের জন্য প্রাইভেট টিউশনি পরিপূরক বা সাপ্লিমেন্টারি ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।

তাছাড়াও, বাপ-মায়ের চিরকালীন প্রবণতা হল সন্তানের জন্য 'বিশেষ' ব্যবস্থা করা — বাড়তি সুযোগ করে দেওয়া। এই কারণেও কোনো-না-কোনোভাবে প্রাইভেট টিউশনির দুনিয়া-জোড়া চাহিদা বরাবরই ছিল— আজও আছে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে রাজা মহারাজারা নিজ প্রাসাদে গৃহশিক্ষকদের মাইনে দিয়ে রাখতেন। তাঁরা রাজপুত্রদের লেখাপড়া শেখাতেন। গল্প নয়, সত্যি কথা, ইংল্যান্ডের বর্তমান যুবরাজ চার্লসেরও গৃহশিক্ষক ছিলেন, সেই শিক্ষক একজন বাঙালি — আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌত্র।

কিছু পাঠকের মনে পড়বে ৫০/৬০ বছর আগে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও গৃহশিক্ষকরা বাস করতেন। স্বাধীনতা-পূর্বকালে এই প্রাবন্ধিকের শৈশব কেটেছে অধুনা বাংলাদেশের পাবনায়। সেখানে আমাদের গৃহশিক্ষক টাপুদা (নিকটস্থ গ্রাম বেড়া থেকে আগত) আমাদেরই বাড়িতে থাকতেন, দিনের বেলায় পড়তেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে, এবং সকাল-সন্ধ্যে আমাদের নিয়ে পড়াতে বসতেন। নিজেও পড়তেন, আমাদেরও পড়াতেন।

মানতেই হবে, প্রাইভেট টিউশনি বরাবরই 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' গোছের ব্যাপার। এই বাজার একেবারেই 'মুক্ত'— ফ্রি মার্কেট। একদিকে যিনি যত ধনী, যত বেশি মূল্য দিতে পারেন, তিনি তত মহার্ঘ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারবেন। আর একদিকে যে শিক্ষক যত কম দামে বেশি 'ভাল মাল' (যথা, সম্ভাব্য প্রশ্ন) দিতে পারবেন তাঁর তত বেশি খদ্দের জুটবে। আবার যিনি বেশি উদ্যোগী তিনি কয়েকজন টিউটর খাটিয়ে একটা কোচিং বিপণি খুলে ফেলবেন; মুনাফাও বাড়তে থাকবে লাফিয়ে লাফিয়ে।

স্পষ্টতই গরিব-গুর্বোদের জন্য বাড়তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে তার দায় নিতে হবে সরকারকেই। সে চেষ্টাও এ দেশে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দুর্বল (বিশেষত তফসিলি) ছাত্রছাত্রীদের জন্য রিমিডিয়েল টিচিং বা সংশোধনী শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করতে গিয়েছে এবং কার্যত ব্যর্থ হয়েছে।

প্রাইভেট টিউশনি সমান্তরাল বা প্যারালাল হয়ে ওঠার ইতিহাসও এ দেশে যথেষ্ট প্রাচীন। প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন এবং পরে এম এ পর্যন্ত কলা-বিষয়ক পরীক্ষার প্রাইভেট

ক্যান্ডিডেটেরা বসার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওই ব্যবস্থার প্রচলন হতে থাকে। এই সব পরীক্ষার্থীরা স্কুল কলেজে পড়তেন না, তাই তাঁরা সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন প্রাইভেট টিউটর এবং কোচিং বিপণির ওপর। এটাকে পরিপূরক না বলে সমান্তরাল বলার একটা বাড়তি কারণ হল, মূল ব্যবস্থার মতো এখানেও সেরা মাঝারি ও নিম্নমানের ছাত্রছাত্রীর অবস্থিতি বরাবরই ছিল।

উল্লেখ্য, সমান্তরাল ব্যবস্থায় পঠনপাঠনের সময় কম থাকায় অল্প পড়ে বেশি মার্কস পাওয়ার আর্তি অপেক্ষাকৃত বেশিই ছিল। অতএব বাছাই করা V.V.Imp প্রশ্নোত্তরের জন্য আকুতি যে সমান্তরাল ব্যবস্থাতেই বেশি হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই প্রয়োজনের জের ধরেই 'সাজেশনস' নামাঙ্কিত শিক্ষা-বিধ্বংসী নষ্টামির বাড়-বাড়ন্ত শুরু হয়। এই কথা স্বীকার করে, কিছুটা স্ববিরোধিতার ঝুঁকি নিয়েই বলছি, সেকালে টিউশনি এবং কোচিং-এর সমান্তরাল ব্যবস্থা মূল ব্যবস্থার ওপরেই নির্ভর করত।

উদাহরণ, অতীতে টেস্ট পেপারস প্রণেতারা সেরা স্কুলগুলোর টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা নিশ্চিত করতেন, যেন ওই সব প্রশ্ন পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা বেশি। আর একদিকে কোচিং বিপণিগুলো খোঁজখবর নিত নামজাদা স্কুল-কলেজগুলোতে কোন কোন টপিক জোর দিয়ে পড়ানো হচ্ছে। মিত্র, হিন্দু, হেয়ার প্রভৃতি স্কুল এবং কলেজগুলোর মধ্যে প্রেসিডেন্সির প্রশ্নপত্রের চাহিদা বেশি ছিল। তখন 'সাজশনস' প্রণেতারা দাবি করতেন, তাঁদের দেওয়া প্রশ্ন থেকে আগের বছরে ৮০/৯০ শতাংশ 'কমন' এসেছিল। এ হেন দাবি ভিত্তিহীনও নয়, কারণ তখনকার দিনে যতরকমের প্রশ্ন সম্ভব তার সবই দেওয়া হত। এ থেকে বোঝা যায়, সেকালে প্রশ্ন ফাঁস করা এখনকার মতো সহজ ছিল না। অন্য কথায়, পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত কম বিক্রয়যোগ্য হওয়ায় সে কালে প্রাইভেট টিউটরদের কিছু অন্তত শিখিয়ে পয়সা রোজগার করতে হত।

এ সব সত্ত্বেও, মানতেই হবে, টিউশনি নিয়ে অনাচার বামফ্রন্টের আমলে চূড়ান্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার সূত্রপাত ঘটেছে অনেক আগে। কংগ্রেসি আমলে কিছু প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে অর্থপুস্তক প্রণেতাদের যোগসাজস নিয়ে ফিসফিসানি শোনা যেত। আজ যেমন টিউটোরিয়াল হোমের মালিক নিজেই প্রশ্নকর্তা নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন তেমন অতীত ঘটনার কথা প্রাবন্ধিকের জানা নেই। তবে কোনও কোনও স্যারের লেখা বই থেকে যে বেশি প্রশ্ন 'কমন' পাওয়া যেত, এবং ফলে সে-সব বই বিক্রিও হত হু হু করে, তা অনেক পাঠকেরই মনে পড়বে। পুস্তক রচয়িতা নিজে প্রশ্ন করতেন না — করতেন তাঁর কোনও ছাত্র, যিনি হয়ত স্যারের মৌখিক সুপারিশে প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হয়ে যেতেন।

অন্য কথায়, পরীক্ষাব্যবস্থায় সেকালের সাধারণের দৃষি-অগোচর খিড়কি দরজাটা বামফ্রন্টের আমলে সিং-দরজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন তাই কোচিং বিপণিগুলো উত্তম সাজেশনস (পড়ুন, প্রশ্নফাঁস)-এর ব্যবস্থা না করে ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবে না। ভুললে না, কত কম শিখে কত বেশি মার্কস পাওয়া যায় তারই প্রতিযোগিতা চলছে এ কালে। অতএব জয়তু সত্যদা।

সমস্যার আর একদিক হল, ছাত্রসংখ্যা। কথা ছিল, শিক্ষক-পিছু অনধিক ৪০ জন ছাত্র থাকবে। রাজ্যের স্কুলগুলিতে ক্লাসরুমও অনধিক ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর বসার উপযুক্ত করে তৈরি। ওই রকম ঘরে এখন বসানো হচ্ছে কমবেশি ১০০ জন ছাত্রছাত্রী। কিছু স্কুলে আবার প্রত্যেক ছাত্রকে রোজ স্কুলে আসার যুযোগই দেওয়া যাচ্ছে না। উত্তরবঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি ছাত্ররা যখন বলে 'বসতে জায়গা পাচ্ছি না স্যার' তখন তাঁরা বলেন 'ভর্তির সময় তো বাপ-মাকে বলেছিলাম, সকলকে বসার জায়গা দিতে পারব না; তোরা রোজ আসিস কেন?'

যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র স্কুলে নাম লিখিয়েও ক্লাসে বসার জায়গা পায় না — যারা পায় তারাও কিছু শিখে না— তাদের প্রাইভেট টিউশনিই একমাত্র ভরসা। মন্ত্রী মশায়রা বিলক্ষণ জানেন, প্রাইভেট টিউশনি সত্যিসত্যি বন্ধ করে দিলে অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে। তাই বলছিলাম, ওঁদের হুংকারে কান দেবেন না।

এতক্ষণ যা বোঝাবার চেষ্টা করলাম তা হল, বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাইভেট টিউশনি নয় --- প্রাইভেট টিউশনি-সর্বস্বতা। টিউশনি এখন মূল ব্যবস্থার সমান্তরাল বা পরিপূরক নয়— এটাই একমাত্র ব্যবস্থা। সর্বনাশ এখানেই। ভেবেচিন্তেই 'সর্বনাশ' শব্দটি ব্যবহার করলাম।

মার্চ-এপ্রিল ২০০২ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

উমা

দশাবতার-ভাষ্য (১)

জোতীরাও গোবিন্দরাও ফুলে

[অনূদিত অংশটি মারাঠি ভাষায় রচিত ফুলের প্রসিদ্ধ *গুলামগিরি* (১৮৭৩) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। *স্লেভারি* নাম দিয়ে বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মায়া পণ্ডিত। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের জন্য জি পি দেশপাণ্ডে সম্পাদিত *সিলেক্টেড রাইটিংস অব জোতীরাও ফুলে* (লেফটওয়ার্ড, নয়া দিল্লি ২০১৬) বইয়ের পাঠটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। টীকাগুলিও ওই বই থেকেই সংগৃহীত। উল্লেখ্য, *গুলামগিরি* মারাঠি ভাষায় লেখা হলেও ফুলে স্বয়ং ইংরেজিতে এর ভূমিকাটি লেখেন।

গুলামগিরি বইটি ফুলে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধু জনগণের' উদ্দেশে নিবেদন করেছিলেন। মারাঠি ও ইংরেজি দুটি ভাষায় সেই উৎসর্গবাণী বইটির শুরুতেই মুদ্রিত হয়েছিল। দেশপাণ্ডেজী সম্পাদিত থেকে তার একটি আলোকচিত্র নীচে দেওয়া হল।]

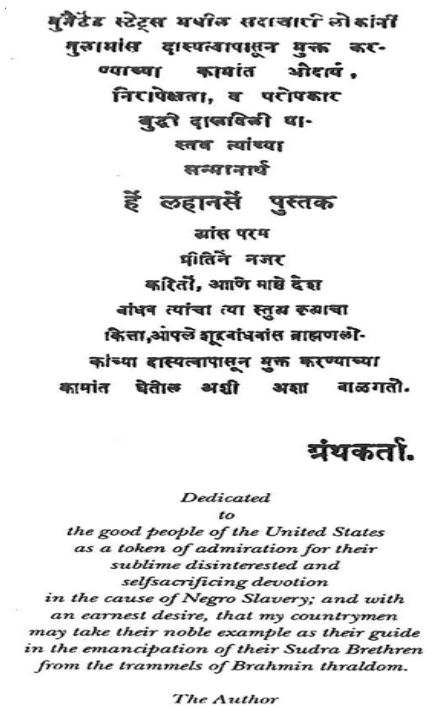

युनैटेड स्टेट्स मधील सदाचारी लोकांनीं
गुलामांस दास्यत्वापासून मुक्त कर-
ण्याच्या कामांत औदार्य,
निरपेक्षता, व परोपकार
बुद्धी दाखविली या-
स्तव त्यांच्या
सन्मानार्थ
हें लहानसें पुस्तक
त्यांस परम
प्रीतिनें नजर
करितों, आणि माझे देश
बांधव त्यांचा त्या स्तुत्य कृत्याचा
कित्ता, आपले शूद्रबांधवांस ब्राह्मणलो-
कांच्या दास्यत्वापासून मुक्त करण्याच्या
कामांत घेतील अशी अशा बाळगतो.

ग्रंथकर्ता.

Dedicated
to
the good people of the United States
as a token of admiration for their
sublime disinterested and
selfsacrificing devotion
in the cause of Negro Slavery; and with
an earnest desire, that my countrymen
may take their noble example as their guide
in the emancipation of their Sudra Brethren
from the trammels of Brahmin thraldom.

The Author

জোতীরাওয়ের বাণীর অনুবাদ :

দাসপ্রথা নির্মূল করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধু জনগণের মহৎ, নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগী সাধনাকে কুর্নিশ জানিয়ে তাঁদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ নিবেদিত হল। সেই সঙ্গে জানাই এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা যে আমাদের দেশের মানুষ যেন তাদের শূদ্র ভ্রাতৃবৃন্দকে ব্রাহ্মণ্য শৃঙ্খল হতে মুক্তির লক্ষ্যে এই উন্নত দৃষ্টান্তকে পথনির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

ফুলে-ধোন্দিবা সংলাপ

প্রথম ভাগ

ব্রহ্ম, সরস্বতী এবং ইরানি অথবা আর্য

ধোন্দিবা: ইউরোপের ফরাসি, ইংরেজ প্রমুখ মঙ্গলকারী সরকারগুলি একজোট হয়ে দাসপ্রথা রদ করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে তারা *মনুস্মৃতি*-তে লিখিত ব্রাহ্মণ্য আইন অগ্রাহ্য করেছিল। *মনুস্মৃতি*তে লেখা আছে, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি করেছিল তার মুখ থেকে, আর শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিল তার পা থেকে, যাতে শূদ্ররা কেবল ব্রাহ্মণদের সেবা করতে পারে।

জোতীরাও: তুমি বলছ, ইংরেজ, ফরাসি এবং অন্যান্য সরকার দাসপ্রথা রদ করেছিল আর তার অর্থ, তারা ব্রাহ্মণ্য আইনকে অগ্রাহ্য করেছিল। কিন্তু পৃথিবীতে তো কত রকম আলাদা আলাদা মানুষ আছে, তাই না? আমাকে বলো, সেই সব লোকেদের সৃষ্টি নিয়ে *মনুস্মৃতি* কী বলছে? ব্রহ্মার কোন অঙ্গ থেকে তাদের উৎপত্তি?

ধোন্দিবা: এ বিষয়ে সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে ব্রাহ্মণরা বলে, ইংরেজ বা ওই ধরনের লোকেরা তো নীচ, অসভ্য পাপী, তাই *মনুস্মৃতি*তে তাদের কোনো উল্লেখ নেই।

জোতীরাও: তার মানে তুমি বলছ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউই নীচ পাপী নয়?

ধোন্দিবা: আসলে তো অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এই ধরনের লোকের সংখ্যা ঢের বেশি।

জোতীরাও: ব্রাহ্মণরা যদি নীচ পাপীই হয়, তাহলে *মনুস্মৃতি*

ওদের নিয়ে লিখল কেন?

ধোন্দিবা: এ থেকেই তো প্রমাণ হয় যে মনু মানুষের উৎপত্তির যে-বিবরণ দিয়েছে তা একেবারে ভুল। তার সহজ কারণটা এই যে এ-বিবরণকে সব মানুষের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না।

জোতীরাও: সেই কারণেই ইংরেজ বা ওই ধরনের অন্যান্য দেশের জ্ঞানী ব্যক্তিরা দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, কারণ তাঁরা অনেক ব্রাহ্মণ লেখকের মধ্যে কূটকৌশলী প্যাঁচের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্রহ্মা যদি সত্যি সত্যিই সব মানুষের স্রষ্টা হত, তাহলে তাঁরা এ কাজ করতেন না। মনু চারটি বর্ণের প্রত্যেকটিরই উৎপত্তি বিষয়ে লিখেছে। প্রকৃতির বিবর্তনের সঙ্গে যদি এর তুলনা করি তাহলেই দেখব এটা ডাহা মিথ্যে।

ধোন্দিবা: কী করে?

জোতীরাও: ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ থেকে। ভালো কথা। কিন্তু মনু যে আদি ব্রাহ্মণমাতা সম্পর্কে কিছুই লিখল না, সেটা কেন? ব্রহ্মার কোন্ অঙ্গ থেকে সেই নারীর উদ্ভব হয়েছিল?

ধোন্দিবা: হয়তো তার কারণ এই যে সেই নারী ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ছিলেন একজন নীচ অসভ্য পাপিষ্ঠা। হয়তো তাঁকে ম্লেচ্ছদের বর্গে ফেলা উচিত।

জোতীরাও: এ তোমার কীরকম কথা? তিনি তো ব্রাহ্মণদের আদিমাতা, যে-ব্রাহ্মণরা ছিল দেশের স্ব-নিয়োজিত রাজা, যারা নিজেদের বাকি সবার চেয়ে উন্নত বলে মনে করে। আর সেই নারীকে তুমি কিনা ম্লেচ্ছদের বর্গে ফেলছ? সেখানকার গোরুর মাংস আর মদের দুর্গন্ধ তিনি কী করে সইবেন? না বন্ধু, তোমার এ কথা বলা উচিত নয়।

ধোন্দিবা: কিন্তু আপনি নিজেই তো কতবার ভিড়ে-ঠাসা সভায় বলেছেন যে ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষরা লোকের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোরু মেরে, গোরুর মাংসের অতি উপাদেয় সব পদ রেঁধে খাওয়াদাওয়া করে ফুর্তি করত? তাই যদি হয়, তাহলে এখন কেন বলছেন যে তাদের আদি মাতা ওই দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারতেন না? ব্রিটিশ শাসনের জয়গান গেয়ে আর ক-টা দিন অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন এইসব শুদ্ধপবিত্র ব্রাহ্মণরা তাদের রেসিডেন্ট আর গভর্নর প্রভুদের পাতের এঁটোকাঁটারও এতটুকু ভাগ চাকরবাকরদেরও দেবে না। আপনি কি জানেন না, আজকাল মাহার জাতির অধিকাংশ পরিচারক আড়ালে ব্রাহ্মণদের দিয়ে প্রচুর অসন্তোষ প্রকাশ করে? মনু নিজেই তো আদি ব্রাহ্মণমাতার উৎপত্তি নিয়ে একটা কথাও লেখেনি। তাহলে দোষটা আপনি তাকেই দিন। আমি অশোভন কথা বলছি বলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? যাই হোক, বলুন শুনি ...

জোতীরাও: বেশ। তুমি যা চাইছ তাই হোক। এবার আমাকে বলো, ব্রহ্মার মুখ থেকে যদি ব্রাহ্মণদের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে এমন কোনো লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ কি আছে যে ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রতি মাসে রজঃস্রাব হত এবং তাকে চারদিন সকলের আড়ালে বসে থাকতে হত? নাকি সে লিঙ্গায়েত রমণীদের মতন নিজের দেহ ভস্মে আবৃত করে পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠত?

ধোন্দিবা: না, তেমন কোনো লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। কিন্তু ব্রহ্মাই তো ব্রাহ্মণদের সৃষ্টির উৎস। একজন লিঙ্গায়েত রমণীর উপদেশ তার কেমন লাগবে? আজকের ব্রাহ্মণরা তো লিঙ্গায়েতদের ঘেন্না করে যেহেতু লিঙ্গায়েত রমণীরা রজঃস্রাবের সময়কার চারদিনের অবশ্যপালনীয় পরিচ্ছন্নতার বিধিলিপিগুলি মেনে চলে না।

জোতীরাও: তাহলে এ থেকে তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ যে ব্রহ্মার চারটি জননাঙ্গ ছিল — মুখ, বাহু, শ্রোণি আর পা (কেননা *মনুস্মৃতি* অনুযায়ী চারটি বর্ণ জন্ম নিয়েছিল ওই চারটি অঙ্গ থেকে)। তাই যদি হয়, তাহলে ওই চারটি অঙ্গের প্রতিটি থেকেই নিশ্চয়ই প্রতি মাসে অন্তত চারদিন করে রজঃস্রাব হত, এবং ব্রহ্মাকে প্রত্যেক মাসে ষোলোদিন করে অচ্ছ্যুৎদের মতো সকলের থেকে আলাদা হয়ে বসে থাকতে হত। সেক্ষেত্রে ওই ষোলোদিন বাড়িঘর দেখাশোনা করত কে? *মনুস্মৃতি* এ বিষয়ে কিছু বলছে কি?

ধোন্দিবা: না, কিছু না।

জোতীরাও: বেশ। মুখের মধ্যে গর্ভসঞ্চারের পর থেকে ন-মাস ধরে ভ্রূণের বিকাশ সম্বন্ধে *মনুস্মৃতি* কিছু বলছে কি?

ধোন্দিবা: না।

জোতীরাও: কিন্তু কচি ব্রাহ্মণশিশুটিকে ব্রহ্মা কী করে খাওয়াত, সে ব্যাপারে *মনুস্মৃতি* নিশ্চয়ই কিছু বলেছে? তাকে কি বুকের দুধ খাওয়ানো হত, নাকি অন্য কোনো দুধ? বাচ্ছাটিকে কী করে লালন করা হত?

ধোন্দিবা: না, সে বিষয়েও কিছু নেই।

জোতীরাও: আচ্ছা, ব্রহ্মার তো একটি স্ত্রী ছিল, সাবিত্রী। তা সত্ত্বেও সে মুখের মধ্যে ভ্রূণ বিকাশ ঘটানো, বাচ্চার

জন্ম দিয়ে তাকে নিজের মাথার মধ্যে বড়ো করে তোলার মতো এত ঝক্কি পোহাতে গেল কেন? ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।

ধোন্দিবা: আর ব্রহ্মার অন্য তিনটে মাথা, সেগুলোর কী হল? তারা তো এই বিশ্রী জগঝম্প ব্যাপারটা থেকে মুক্ত ছিল? জারজটা কি এতই ন্যাকা যে বাড়ির বাচ্চা মেয়েরা যেসব খেলা নিয়ে মেতে থাকে সেগুলো তার খুব পছন্দ ছিল?

জোতীরাও : এখানে সমস্যা আছে। ওকে জারজ বলা যাবে কি? কারণ লোকটা তো তার নিজের মেয়ে সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গম করেছিল। সেইজন্যেই তো ওর আরেক নাম কন্যা-সঙ্গমী। এই জঘন্য কাজটি করেছিল বলেই কেউ ওকে খাতির করে না, পুজোও করে না।

ধোন্দিবা: আচ্ছা, ব্রহ্মার যদি সত্যিই চারটে মুখ থাকত, তাহলে ওর নিশ্চয়ই আটখানা স্তন, চারখানা নাইকুণ্ডু, চারখানি জননাঙ্গ আর চারটি পায়ু ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। শেষাদ্রিকে (বিষ্ণুকে) নিয়েও একই সমস্যার কথা তোলা যায়, যার বউ ছিলেন লক্ষ্মী। বৈধ এক বউ থাকতে বিষ্ণু কেন চারমুখো এই শিশুটির জন্ম দিতে গেল? ব্রহ্মাকে নিয়ে আমরা যেমন প্রশ্ন করছি, তেমনি বিষ্ণুকে নিয়েও তো প্রশ্ন তোলা উচিত।

জোতীরাও: সবদিক বিবেচনা করে আমরা যে-নির্ভেজাল সত্যে উপনীত হচ্ছি তা হল, আদিতে ব্রাহ্মণরা থাকত ইরানে, যার অবস্থান সাগরপারে। বেশ কয়েকজন ইংরেজ ইতিহাসবিদ বই লিখে প্রমাণ করেছেন যে তখন তাদের নাম ছিল ইরানি অথবা আর্য। গোড়ার দিকে আর্যরা নিজেদের ছোটো ছোটো সেনাদলে সংগঠিত করে বেশ কয়েকবার এদেশ আক্রমণ করেছিল। তারা প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যেরই জীবনযাত্রা ব্যাহত করেছিল। কিছুকাল পরে বামনের বদলে ব্রহ্মা হল এদের সর্দার। সে লোকটি ছিল গোঁয়ারগোবিন্দ। সে বেশ কয়েকজন দেশীয়কে, যারা কিনা আমাদের আদি পূর্বপুরুষ, যুদ্ধে পরাস্ত করে দাসে পরিণত করল। অনেক আইন প্রণয়ন করে সে এইসব দাসদের স্থায়ীভাবে নিজ দেশের জনগণের থেকে পাকাপাকিভাবে আলাদা করে দিল। ব্রহ্মা মরবার পর আর্যরা তার নামানুসারে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে ডাকতে লাগল। আদিতে তাদের কী নাম ছিল সেটা স্রেফ ভুলে গেল। মনু প্রমুখ নেতারা এই ব্রহ্মারই পথ অনুসরণ করল। ব্রহ্মার তৈরি-করা নিয়মগুলো পাছে লঙ্ঘিত হয়, এই ভয়ে তারা ব্রহ্মাকে নিয়ে অদ্ভুত কতকগুলো অতিকথা রচনা করে ছড়িয়ে দিল। তারা দাসদের এইকথা বিশ্বাস করাতে চাইল যে যাকিছু ঘটেছে সবই দৈবনির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ঘটেছে। তাই তারা শেষাদ্রিকে নিয়ে আরেকখানা বিদঘুটে অতিকথা তৈরি করাল। কিছুকাল ধরে এইসব লেখাপত্র সহজেই কয়েকখানা বইয়ের মধ্যে সংকলিত হল। নারদ নামে তাদের একটি ধূর্ত, কূটকচালে আর মেয়েলি সহকর্মী ছিল, যে সারাক্ষণ রমণী-পরিবৃত হয়ে থাকত, সে ওইসব বই থেকে 'সুসমাচার'গুলি শূদ্র আর দাসদের মধ্যে প্রচার করে বেড়াতে লাগল। কাজেই ব্রহ্মার খাতির আরও বেড়ে গেল। তবে আজ যদি আমরা শেষাদ্রিকে নিয়েও এই ধরনের অনুসন্ধান চালাই, সেটা আমাদের দুজনের পক্ষেই হবে নেহাত সময়ের অপচয়। বেচারীকে চিৎ করে শুইয়ে নাভির গর্ভ থেকে এই চারমুখো শিশুটির জন্ম দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। আমার মতে, যে-মানুষ ইতিমধ্যেই ধরাশায়ী তাকে আবার চেপে ধরে আমাদের শক্তি দেখানোটা মোটেই বীরোচিত কাজ হবে না।

ভক্তিসূত্রর রচয়িতা বলে কথিত।

(চলবে)

অনুবাদক : আশীষ লাহিড়ী

উমা

গ্রাহকদের কাছে আবেদন

সাধারণ ডাকযোগে কেউ কেউ পত্রিকা পান না বলে অভিযোগ জানান। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ ডাকবিভাগের ওপর আমাদের ভরসা করতে হয়। পত্রিকা না পেলে দ্বিতীয়বার আবার ডাকযোগে আমাদের পক্ষে পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়। আমাদের ওয়েবসাইটে পত্রিকার সংখ্যাগুলি দেখে নেবেন।

কালিনাথ রায় : এক বিস্মৃত বাঙালি সাংবাদিক

নিরঞ্জন হালদার

বাঙালি সাংবাদিক কালীনাথ রায়ের নামের সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের পরিচয় নেই। তাদের জানার সুযোগও কম। কারণ কালীনাথ রায় সাংবাদিক জীবনের ৩৫ বছর কাটিয়েছেন পাঞ্জাবে লাহোরে দুটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। অবশ্য যাঁরা সাংবাদিকতা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তাঁদের নটরাজনের 'দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান জার্নালিজম' (১৯৬৪) পড়তে হয়েছে। একমাত্র তাঁরাই জালিয়ানওয়ালাবাগে গণহত্যার পরে সামরিক আইনে গ্রেপ্তার হওয়া 'দি ট্রিবিউন' সম্পাদক কালীনাথ রায়ের নামের সঙ্গে পরিচিত। ১৯০০ সালে কালীনাথ রায় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সম্পাদিত কলকাতা থেকে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিকতা শুরু। মাঝে এক বছর অসমের একটি দৈনিকের সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৩ সালে লাহোরে যান 'দি পাঞ্জাবি' দৈনিকের সম্পাদক হয়ে। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে তিনি লাহোরের 'দি ট্রিবিউন' দৈনিকে যোগদান করেন সম্পাদক হিসেবে। হাঁপানির জন্য লাহোরে শীতকালে কষ্ট পেতেন বলে পদত্যাগ করে খুলনার বাড়িতে চলে আসেন ১৯৪১ সালে। আবার তাঁকে দি ট্রিবিউনের প্রধান সম্পাদক হয়ে লাহোরে যেতে হয়। সেখান থেকে সপ্তাহ দুই বা তিন দিন ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় টেলিগ্রামে লাহোরে পাঠাতেন। ট্রিবিউন ট্রাস্ট তাঁকে পত্রিকার প্রধান সম্পাদক করে ১৯৪৩ সালে আবার তাঁকে লাহোরে নিয়ে যান। কলকাতার 'দি বেঙলী' পত্রিকায় তিনি স্বনামে নিশ্চয়ই লিখতেন, নইলে পাঞ্জাবের ইংরেজি দৈনিক তাঁকে সম্পাদক করে লাহোরে নিয়ে যাবে কেন? আবার লাহোরের দৈনিক পাঞ্জাবিতে তাঁর লেখা পড়েই দি ট্রিবিউনের ট্রাস্টিরা তাঁকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক করে নেন। এই বইটিতে জালিয়ানাওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের আগে পিছে ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত কালীনাথ রায়ের লেখা, কালীনাথ রায় সম্পর্কে খবর এবং জালিয়ানওয়াবাগের হত্যাকাণ্ড এবং পাঞ্জাবের সামরিক শাসনে সন্ত্রাসের সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এতদিন কালীনাথ রায়ের লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না, তিনি কেন ট্রিবিউন পত্রিকার সম্মানীয় সম্পাদক ছিলেন। আমরা তাঁর লেখা পড়ে এখন তা জানতে পারব।

কালীনাথ রায় জন্মেছিলেন ১৮৭৫ সালে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা শহরে। খুলনা তখন ছিল যশোর জেলার একটি মহকুমা শহর। খুলনা জেলা হয় ১৮৮৮ সালে। নতুন শহরে ডাক্তার ও আইনজীবী হিসাবে প্রথমে আসেন যশোর জেলার পাঁজিয়া গ্রাম থেকে কায়স্থরা। শিক্ষাকে জীবিকা গ্রহণ করে বৈদ্যরা এসেছিলেন যশোর জেলার কালিয়া গ্রাম থেকে।

কালীনাথ রায় খুলনা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে এফ.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় কলেজের পড়া ছেড়ে দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম থেকেই ট্রিবিউন পত্রিকার সঙ্গে বাঙালিদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিখিল ভারত কংগ্রেস সংগঠন

গড়ে তোলার জন্য লাহোরে গিয়ে দানবীর সর্দার মাজিথিয়ার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তাঁকে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেন। পরে তারই প্রেরণায় মাদ্রাজ থেকে হিন্দু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সর্দার মাজিথিয়ার অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ ট্রিবিউন পত্রিকার জন্য কলকাতা থেকে প্রেস কিনে লাহোরে পাঠান। সর্দার মাজিথিয়ার অনুরোধে প্রস্তাবিত পত্রিকা সম্পাদনার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেঙলী' পত্রিকা থেকে সাংবাদিক শীতলা চট্টোপাধ্যায়কে লাহোরে পাঠান। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে। আর্থিক অসুবিধার জন্য বিপিনচন্দ্র পাল ঐ পত্রিকায় কিছুদিন সাব এডিটরের চাকরি নিয়েছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষা পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল। কালীনাথ রায় যখন ট্রিবিউনের সম্পাদক হন, তখন পত্রিকার দৈনিক প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। সর্দার মাজিথিয়া ট্রিবিউনের সম্পাদকের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য ট্রিবিউন-ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন। পত্রিকার মালিকানায় অংশ আছে এমন কেউ ঐ ট্রাস্টের সদস্য হতে পারতেন না। ঐ ট্রাস্টের নজরদারির জন্য কালীনাথ রায় স্বাধীনভাবে 'দি ট্রিবিউন' পত্রিকা সম্পাদনা করতে পারতেন। জালিয়ানাওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক আইনের শাসনে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সম্পাদক কালীনাথ রায়ের সঙ্গে ট্রিবিউন ট্রাস্টের এক সদস্য এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের প্রথম বিভাগীয় প্রধান এবং প্রথম মিন্টো প্রফেসর ড. মনোহর লালও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের অবসানে ভারতীয়দের শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে। তখন চরমপন্থী, নরমপন্থী সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে সকলেই টাকা ও ঋণ দিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। একমাত্র পাঞ্জাবের কৃষকেরা গদর পার্টির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে। যাই হোক যুদ্ধের অবসানে কাঙ্ক্ষিত আইনের বদলে ব্রিটিশ সরকার বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখতে রাওলাট বিল আইনে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সময়েই কালীনাথ রায় ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক হন। কালীনাথ রায় প্রস্তাবিত আইনটিকে 'আইনহীন আইন' আখ্যা দেন। সর্বস্তরের মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও, কাউন্সিলে সরকারি পক্ষের ভোটে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রাওলাট বিল আইনে (124A of I.P.C) পরিণত হয়। কালীনাথ রায় তাঁর লেখার মাধ্যমে পাঞ্জাবের জনমতকে উত্তপ্ত করেন। বিলটি আইনে পরিণত হলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে আইনটি প্রত্যাহার করার কথা ভাবেন এবং বোম্বেতে এই উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ সমিতি গঠন করেন। সমিতির নামে ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল রাওলাট আইন প্রত্যাহারের দাবিতে সারা ভারতে বয়কট ও ভুখা দিবস পালনের আহ্বান জানান। সব অফিস, কাছারি, দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, কলকারখানা বন্ধ থাকবে, সকলে উপবাস করে প্রতিবাদ করবে। এই নতুন ধরনের প্রতিবাদে সারা ভারতের জনগণ এই প্রথম একসঙ্গে প্রতিবাদ করে। গান্ধী বোম্বেতে ঐ দিন এক লক্ষ মানুষের জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। পাঞ্জাবেও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। গান্ধী উত্তরভারত, অসম, কলকাতা, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ ভারতে গিয়ে হরতালের জন্য প্রচার করেছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবে যান নি। দি ট্রিবিউনে কালীনাথ রায়ের 'ন্যাশনাল প্রোটেস্ট' লেখাটি সেই কাজটি করে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারত কংগ্রেস গঠনের সময় লিখেছিলেন, 'এ নেশন ইন মেকিং'। গান্ধীর আহ্বানে 'নেশন' বাস্তবে পরিণত হল। লেনিনের পরামর্শে মানবেন্দ্রনাথ রায় মস্কোতে অবনী মুখোপাধ্যায়ের সহায়তা নিয়ে ১৯২২ সালে লেখেন, 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশান'। গান্ধী-নিন্দুক মানবেন্দ্রনাথ রায় ঐ গ্রন্থে লেখেন, 'এই প্রথম ভারতের জনগণকে সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বারুদ তৈরি ছিল, গান্ধী তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।' বারুদ যে আগুনের অপেক্ষায় ছিল, তার প্রমাণ মিলল পাঞ্জাবে। রাওলাট আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ৬ এপ্রিল পাঞ্জাবে শান্তিপূর্ণ হরতাল, অরন্ধন, শোভাযাত্রা, জনসভা হওয়ায় লেফটেনান্ট গভর্ণর মাইকেল ডায়ার পাঞ্জাবের মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার হুমকি দেন। তাঁর জবাব কালীনাথ রায় 'দি ট্রিবিউনে' দিয়েছিলেন। (যে লেখাটির জন্য কালীনাথ রায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।) কালীনাথ রায়ের ঐ লেখার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় হতে পারে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকার ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত মানিক ভাইয়ের 'কলম'। ১০ এপ্রিল অমৃতসরের তিন কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করে ভিন্ন রাজ্যের জেলে পাঠানো হয় এবং গান্ধীকে পাঞ্জাবে ঢুকতে

না দিয়ে পাঞ্জাব সীমান্ত থেকে ট্রেনে বোম্বাইতে ফেরৎ পাঠানোর সংবাদে অমৃতসরে বিক্ষোভ হয়। সরকার বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানোয় মারমুখী জনতা ইউরোপিয়ানদের খুন করে এবং পিটিয়ে মারে। এই মারমুখী জনতাকে শায়েস্তা করার জন্য লেফটেনান্ট গভর্ণর মার্শাল ল জারি করে গোটা প্রদেশকে মিলিটারির হাতে তুলে দেন। তারই পরিণতিতে ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে কোনো রকম সতর্ক না করে মাইকেল ডায়ারের সেনারা নিরস্ত্র সমবেত জনতাকে গুলি করে মারে। আহতদের চিকিৎসার অভাবে অনেকেই মারা যান। ১১ এপ্রিল প্রেস-সেনসরশিপ চালু হয়। প্রতিবাদে একটি দৈনিক ছাপানো বন্ধ হয়। সারা প্রদেশে সামরিক বাহিনীর সন্ত্রাস অব্যাহত থাকে। হাজার হাজার নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পোরা হয় এবং সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের নামে কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড দেয়। লেফটেনান্ট গভর্ণরের বিরুদ্ধে লেখার জন্য কালীনাথ রায়কে গ্রেপ্তার করে লাহোরে জেলের নির্জন ছোট কুঠুরিতে তালাবন্ধ করে রাখত। দিনে আধঘণ্টার জন্য জেলের বাইরে আনত। অসুস্থ হওয়ায় তিনবার তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল।

সামরিক ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁর পছন্দের আইনজীবীকে কলকাতা থেকে পাঞ্জাবে আসতে দেওয়া হয় নি। বিচারের সময় নোট করার জন্য এক টুকরো কাগজ ও পেন্সিল দেওয়া হয় নি।

কালীনাথ রায়ের পছন্দের আইনজীবীকে কলকাতা থেকে পাঞ্জাবে আসতে না দেওয়ার প্রতিবাদে গান্ধী সারা দেশের কংগ্রেস কমিটির নিকট আবেদন করেন। সর্বত্র জনসভা করে কালীনাথ রায়ের মুক্তির দাবিতে প্রস্তাব পাশ করিয়ে ভাইসরয়ের নিকট পাঠাতে বলেন। তিনি ঐ বিবৃতিতে জানান, সংযম ও শালীনতা কালীনাথ রায়ের লেখার বৈশিষ্ট্য। সারা ভারতের মতো বাংলার মানুষ ঐ প্রথম কালীনাথ রায়ের নাম শুনল। গান্ধী তখনও কংগ্রেসের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন হোমরুল লীগের সভাপতি। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস জনসভা করে কালীনাথ রায়ের মুক্তির দাবিতে জনসভা করে প্রস্তাব পাস করে তা ভাইসরয়কে পাঠিয়ে দেয়। খুলনা শহরে প্রথম প্রকাশ্য জনসভা হয় কালীনাথ রায়ের মুক্তির দাবিতে। কালীনাথ রায়ের মুক্তির জন্য জনসভার উদ্যোগ নেওয়ায় এক যুবককে তাঁর বাবা ত্যাজ্যপুত্র করেন। কালীনাথ রায় লাহোরের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্রামের জন্য খুলনার বাড়িতে এসে ঘটনাটি জানার পর ঐ যুবক জ্ঞান ভৌমিককে নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জ্ঞান ভৌমিক ছিলেন খুলনা জেলায় একমাত্র সারাক্ষণের কংগ্রেস কর্মী। ১৯২২ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হলে খুলনা শহরে পত্রিকার এজেন্ট হন। সেটাই ছিল তাঁর জীবিকা। যে-মাঠে গান্ধীর আবেদনে কালীনাথ রায়ের মুক্তির দাবিতে জনসভা হয়েছিল, সেই মাঠেই জ্ঞান ভৌমিক গান্ধীর জন্য জনসভা করেছিলেন ১৯২৫ সালের ১৬ জুন। ঐ দিন চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিং-এ মারা যান। গান্ধী বক্তৃতা করার সময়েই চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুসংবাদ বয়ে আনা টেলিগ্রামটি পান। ঐ দিন রাত্রের ট্রেনে তিনি খুলনা থেকে রওনা দেন। পরের দিন চিত্তরঞ্জন দাশের মৃতদেহ বয়ে আনা হয় দার্জিলিং মেলে। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই তিনি শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে শোকগ্রস্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করেন। খুলনা পৌরসভার মাঠটি দেওয়াল দিয়ে ঘিরে পার্কটির নাম রেখেছিল গান্ধী পার্ক। পাকিস্তানে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঐ পার্কের নাম বারবার বদলে গিয়েছে।

লাহোরের সামরিক আদালত কালীনাথ রায়কে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেয় এবং দু হাজার টাকা জরিমানা করে। তিনি স্থানীয় আদালতে এবং ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে সামরিক ট্রাইবুনালের শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করেন। প্রথমত, সামরিক ট্রাইবুনালের বেসরকারি ব্যক্তিদের বিচার করার অধিকার নেই এবং তাঁর লেখার জন্য অমৃতসরে অশান্তি হয়েছে, সেটাও প্রমাণ করা হয় নি। স্থানীয় আদালত তাঁকে নিরপরাধ ঘোষণা করে। তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। প্রিভি কাউন্সিলও তাঁর যুক্তি মেনে কালীনাথ রায়কে নির্দোষ ঘোষণা করে। প্রিভি কাউন্সিলে তাঁর আপিলে জানা যায়, সামরিক ট্রাইবুন্যাল অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। যাঁরা প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিলেন তাঁরা কারাদণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। অন্যান্য শাস্তিপ্রাপ্তরা প্রিভি কাউন্সিলে আপিল না করায় তাঁদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। জেল থেকে মুক্তির পর ট্রিবিউনে প্রকাশিত কালীনাথ রায়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য লাহোর জেলে দেখেছিলেন। সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ভিন্ন মত প্রকাশের ব্যাপারে সাংবাদিকদের

স্বাধীনতার প্রশ্ন কালীনাথ প্রিভি কাউন্সিলে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল এই প্রশ্নে নীরব থাকে।

সামরিক শাসন জারির পর পাঞ্জাব সারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। দি ট্রিবিউনের পুনর্মুদ্রিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ভিন্ন রাজ্যে পাঞ্জাবের নৃশংসতার খবর ছাপানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে আইন হয়, বোম্বে ক্রনিকলের ইংরেজ সম্পাদক নিজের নামে পাঞ্জাবের নৃশংসতার বিবরণ ছাপানোয় সম্পাদককে ভারত থেকে বহিষ্কার করে ইংলন্ডে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকার জামানত দুবার বাজেয়াপ্ত করা হয়। গান্ধী পাঞ্জাবে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে পাঞ্জাবে যান ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথের এক ভাগ্নী সরলা দেবী চৌধুরাণীকে নিয়ে বিভিন্ন জেলার ৩৭৪টি ঘটনার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কংগ্রেস তদন্ত কমিটিতে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি সদস্য থাকা সত্ত্বেও একা গান্ধীই পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন। তাঁর জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা সর্বভারতীয় ব্যাপারে পরিণত হয় এবং গান্ধী কংগ্রেসের প্রধান নেতা হন। সে-সবের জন্য পাঞ্জাবে ঘটনা ঘটার সময় সংবাদপত্রে কিছু ছাপানোর সুযোগ ছিল না। কালীনাথ রায় নিজের লেখা এবং সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দি ট্রিবিউনকে জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা এবং পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনাগুলোর তথ্যভাণ্ডারে পরিণত করেছিলেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পাঞ্জাবের নৃশংস ঘটনার বিতর্কে কালীনাথ রায়ের লেখা এবং দি ট্রিবিউনের প্রকাশিত তথ্য উদ্ধৃত হত।

কালীনাথ রায় কলকাতা ও লাহোরে থাকলেও তাঁর বাড়ির লোকজন খুলনায় থাকত। তাঁর একমাত্র ছেলে সমরেন্দ্র রায় খুলনা জিলা স্কুল থেকে পাশ করে দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে আই এস সি-তে ভর্তি হন। ঐ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এস সি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছিলেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি এস সি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। এম এস সি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। ড. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের অধীনে রাশিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু গবেষণার পরীক্ষা প্রকাশের ব্যাপারে ড. মহলানবীশের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে আমেরিকায় নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর কলকাতার দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে তাঁর অবিচুয়ারি আমাকেই লিখতে হয়েছিল। খুলনার বাড়িতে থাকতেন তাঁর এক বিধবা বোন এবং চার ছেলে সমেত অসুস্থ ছোট ভাই এবং তাঁর স্ত্রী। তাদের দেখাশোনা করতেন জ্ঞান ভৌমিক। প্রতিমাসে টাকা আসত কালীনাথ রায়ের নিকট থেকে। তার মৃত্যুর পর ছেলে টাকা পাঠানো বন্ধ করায় তাকে খুলনার বাড়ি বদলাবদলি করে কলকাতায় চলে আসতে হয়।

১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর কলকাতায় কালীনাথ রায় মারা যান। তখন কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন চলছিল। তাঁর মৃত্যুর পরের দিন অমৃতবাজার পত্রিকা দুই পৃষ্ঠায় কালীনাথ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নিহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতাদের বিবৃতি ছাপা হয়। আমরা জানতে পারি তিনি কত বড় সাংবাদিক ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভা, কংগ্রেস নেতাদের জনসভা এবং সোদপুরে গান্ধীজীর আস্তানার খবর সংবাদপত্রের সব জায়গা নিয়ে নেওয়ায়, কালীনাথ রায় সম্পর্কে কিছু ছাপানোর জায়গা ছিল না। কালীনাথ রায়ের প্রায় সমসাময়িক বসুমতী সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নিশ্চয়ই কিছু লিখেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা এবং দৈনিক বসুমতী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঐ দুটি পত্রিকা থেকে কালীনাথ রায় সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই। স্টেটসম্যান পত্রিকার পুরনো খবরের জন্য প্রতি পৃষ্ঠার জেরক্স কপি পেতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ পড়ে। তাই কোনো স্বাভাবিক গবেষকের পক্ষে কালীনাথ রায় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া অসম্ভব।

এখন মনে হয়, স্বাধীনতা লাভের আগে কালীনাথের মারা যাওয়া ঠিক হয়েছিল। পাকিস্তানে স্বাধীনতার আগের দিন লাহোরে মুসলিম লীগপন্থীদের তাণ্ডবের ছবি ১৪ আগস্ট ছাপা হওয়ায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে দি ট্রিবিউনের অফিস বন্ধ করে দিতে হয়।

উমা

ওষুধ খাওয়া — নিয়ম-অনিয়ম

ইন্দ্রনীল ঠাকুর

রীতিমতো ব্যস্ত ব্যবসায়ী। বয়স ৬২ বছর। অশোকবাবু দীর্ঘদিনের সুগার ও প্রেসারের রোগী। নিয়মিত ওষুধ খাচ্ছেন প্রায় গত আট বছর ধরে। বাড়িতে ডিজিট্যাল ব্লাড প্রেসারের মেশিন দিয়ে নিয়মিত প্রেসারও চেক করেন। মাস দুয়েক যাবৎ ব্লাড প্রেসার বেশ কমই থাকছে। এদিকে শীতের আমেজও শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ এক সকালে ঘাড়ে অসহ্য যন্ত্রণা। সঙ্গে বমি বমি ভাব। এমন অসহ্য যন্ত্রণা জীবনে যেন এই প্রথম অনুভব করলেন তিনি। প্যারাসিটামল সহ আরও দু'তিন রকমের ব্যথার ওষুধ একসাথে খেয়েও কোনো সুরাহা না মেলায় ভর্তি হলেন কলকাতার এক নামী বেসরকারি হাসপাতালে। সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ল সাব-অ্যারাকনয়েড হেমারেজ। নিউরোলজিস্ট ডা. দাম স্ক্যানের প্লেট দেখেই বললেন— প্রেসার তো হাই ছিল, তাই তো? নিয়মিত ওষুধ খেতেন না নিশ্চয়ই! পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন অশোকবাবুর স্ত্রী, ছেলে, বৌমা। সকলেই হতবাক। প্রায় সকলে মিলে সমস্বরে বলে উঠলেন, না, না, স্যার ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে উনি ভীষণ খুঁতখুঁতে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন একেবারে টো-টো ফলো করে থাকেন। তাও ডাক্তারবাবু এমনটা হল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও সকলকে থামিয়ে অশোকবাবু বলে উঠলেন, ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন। শেষ কয়েকমাস যাবৎ প্রেসারটা প্রায় নর্মাল থাকায় আমি প্রেসারের বড়িটা নিজের মতো করেই একদিন বাদে বাদে খাওয়া শুরু করেছিলাম। আর এতেই এই বিপত্তি। ডা. দাম বললেন: একেবারেই তাই, এই একদিন বাদে বাদে প্রেসারের বড়িটা উনি খাওয়াতে হয়তো যেদিন উনি বড়ি খেতেন না সেই দিনগুলোতে প্রেসারটা খুবই বেড়ে যেত। সেখান থেকেই মাথায় শিরা ছিঁড়ে এই স্ট্রোকটা হয়ে গেল। অশোকবাবুর স্ত্রী শুনেই মূর্চ্ছা যাবার অবস্থা। তিনিও আবার থাইরয়েডের ওষুধ খান। ইদানীং কোমরে ব্যথা হওয়ায় স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাচ্ছেন দিনে দু'টো করে। কিন্তু ১৫০ মাইক্রোগ্রামের থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়ার পরেও রক্তের রিপোর্ট কিছুতেই নর্মাল হচ্ছে না। তাই এবার অশোকবাবুর ছেলে-বৌমা ঠিক করেছেন যে তাঁরা মা-কেও এই হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজিস্টকে দিয়ে একবার চেক করিয়ে নেবেন।

এবার দেখে নেওয়া যাক এই কয়েকটি ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিত্য ওষুধ খাওয়ার নিয়মাবলী সম্পর্কে আমরা ঠিক কি শিক্ষা নিতে পারি। প্রথমত দেখি অশোকবাবুর এই ব্রেন স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল কিনা! উত্তর হচ্ছে— অবশ্যই ছিল। প্রতিনিয়ত শুধুমাত্র অনিয়মিত উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ সেবনের ফলে কত হাজার হাজার ব্রেন স্ট্রোকের ঘটনা যে ঘটছে তার হিসাব দেখলে রীতিমতো শিহরিত হতে হয়। এই পশ্চিমবাংলায় যে কোনও প্রান্তীয় হাসপাতালেই এই সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তাই স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ইস্কিমিক সেরিব্রাল স্ট্রোক-এর চিকিৎসা যাতে টেলি-মেডিসিন-এর সহযোগিতায় প্রান্তীয় হাসপাতালে বসেই করা যেতে পারে তার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। অশোকবাবু যদি সঠিকমাত্রায় প্রত্যহ নিজের হাই ব্লাড প্রেসারের ট্যাবলেটটি সেবন করতেন তাহলে হয়ত এমনটা না-ও হতে পারত। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র একটি পিওর সায়েন্স নয়। এখানে আপাতদৃষ্টিতে কখনই দুয়ে দুয়ে চার হয় না। আপাত বলছি এই কারণে যে হয়তো এই হিসাবের গভীরতায় আমাদের অর্থাৎ মনুষ্য মস্তিষ্ক পৌঁছাতে অক্ষম। একজন চিকিৎসককে শুধুমাত্র তার বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনার গভীরতা থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে গভীর সংবেদনশীলতা, মানুষের অনুভূতি বোঝার ক্ষমতা, রোগীর অর্থনৈতিক সামর্থ্য, যেগুলি আজকের আলোচনার বিষয়

এখন লাইফ স্টাইল ডিজিজ বলে একটা প্রচলিত কথা চিকিৎশাস্ত্রে শোনা যাচ্ছে। এটি কেবলমাত্র একটি রোগ নয়, বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপনে আমরা নানান রোগের শিকার হয়ে চলেছি। সুগার, প্রেসার, স্থূলত্বর সাথে অন্যান্য কঠিন রোগ। মনে রাখতে হবে এসব রোগের চিকিৎসার মূল চাবিকাঠিই হল লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন।

নয়। সুতরাং প্রথম উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারছি রোগের প্রতিরোধ চিকিৎসায়— সঠিক মাত্রা ও সঠিক সময়ে ওষুধ সেবন কতটা জরুরি। এবার উদাহরণের দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোকপাত করি। সেটি হল, অশোকবাবুর স্ত্রীর অবস্থার বিশ্লেষণ। থাইরয়েডের রোগী। ইদানীং কোমরে ব্যথার জন্য ক্যালসিয়ামের ওষুধ খাচ্ছেন, চিকিৎসকের পরামর্শেই। কিন্তু বেশ উচ্চমাত্রায় থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও তার সুরাহা মিলছে না। এক্ষেত্রে সমস্যা থাইরয়েডের বড়ি ও ক্যালসিয়ামের ট্যাবলেট দুটিই দীপান্বিতা দেবীর প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও দুটি ওষুধ খাবার অন্তর্বর্তীকালীন সময়টি সম্ভবত সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়নি বা নির্দেশিত হলেও বোধগম্যতার অভাবে দুটি ট্যাবলেটই তিনি খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে সেবন করেছেন। এই ক্যালসিয়াম থাইরয়েডের ট্যাবলেটটিকে তার সঠিক কর্মসম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করছে বলেই— সঠিক মাত্রায় ওষুধ নেওয়া সত্ত্বেএ তাঁর সুরাহা হচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে শুধু সঠিক ডোজ বা সময়টাই শেষ কথা নয়, একটি নির্দিষ্ট ওষুধ অন্য কোনও ওষুধের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলে তার উপরেও অনেক কিছুই নির্ভর করে। নইলে অযথা স্বাস্থ্যের হানির সাথে অর্থের অপচয়ও ঘটবে। এর সাথে মাথায় রাখতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের বেশ কিছু সাধারণ নিয়মাবলী। যেমন — (১) সঠিক নির্দেশ থাকলে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হবে। যেমন ভাইরাল রোগে অথবা অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার মোটেই সমীচীন নয়। (২) নির্দিষ্ট ডোজ বা মাত্রা ওষুধ সেবন যেমন — বয়স্ক ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শরীরের ওজনের উপর ওষুধের ডোজ নির্ধারণ করা। (৩) দিনের নির্দিষ্ট সময়ে যেমন খালিপেটে, খাবার আগে বা পরে, রাতে শোবার সময়, প্রয়োজনে ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকলে অসুবিধা। এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের কর্তব্য একেবারে প্রাঞ্জল করে প্রেসক্রিপশন লেখা ও ফার্মাসিস্ট-এর কাজ হল সেই প্রেসক্রিপশন রোগীকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

আমরা সকলেই অবগত যে সঠিকমাত্রায় সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে মেডিসিন যেমন জীবনদায়ী তেমনই অধিকমাত্রায় অনিয়মিত মেডিসিনের ব্যবহার প্রাণঘাতী। তাই বিশেষ কয়েকটি মেডিসিন ছাড়া ওভার দ্য কাউন্টার (ওটিসি) কোনো ওষুধ ব্যবহার ঠিক নয়। দু'একটি হাতে গোনা ওষুধ (যেমন প্যারাসিটামল) যা ওটিসি কিনে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রেও ফার্মাসিস্ট-এর পরামর্শ অত্যন্ত জরুরি। এইজন্যই আইনত যে কোনো ওষুধের দোকানে একজন সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত ফার্মাসিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ কিছু মানুষের মানসিকতা দেখা যায় ডাক্তারকে এত টাকা ভিজিট দিয়ে দেখালাম কই বিশেষ কিছুই মেডিসিন তো দিলেন না গোছের। কেউ কেউ আবার প্রেসক্রিপশনে একটা ফাইল বা সিরাপ না থাকলে অসন্তুষ্ট মনে বাড়ি ফিরে যান। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যত বেশি ওষুধ তত বেশি ঝুঁকি! যে ডাক্তারবাবু সঠিক রোগের কারণটি নির্ধারণ করতে পেরেছেন তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশি ওষুধ ব্যবহারের নির্দেশ থেকে বিরত থাকবেন, এটাই কাম্য।

এখন লাইফ স্টাইল ডিজিজ বলে একটা প্রচলিত কথা চিকিৎশাস্ত্রে শোনা যাচ্ছে। এটি কেবলমাত্র একটি রোগ নয়, বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর জীবনযাপনে আমরা নানান রোগের শিকার হয়ে চলেছি। সুগার, প্রেসার, স্থূলত্বর সাথে অন্যান্য কঠিন রোগ। মনে রাখতে হবে এসব রোগের চিকিৎসার মূল চাবিকাঠিই হল লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন। শুরুতে সেখানে নানান ওষুধ সেবনে কোনো লাভ নেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে পলিফার্মাসি থেকেও বিরত থাকতে হবে।

আগেই বলেছি যে শিশু, বয়স্কদের ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাণে ওষুধ না দিলে বৃহত্তর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এর বাইরেও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রেও গবেষণাভিত্তিক ওষুধের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী দিতে হয়। গবেষণার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ওষুধকে এ-ডি এবং এক্স ক্যাটেগরি-তে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে এক্স ক্যাটেগরি-র মেডিসিনগুলি একেবারেই কোনো অসুখের ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন অবস্থায় দেওয়া যায় না। ডি ক্যাটেগরি-র ওষুধগুলির সম্পর্কে যথেষ্ট মেডিকাল রিসার্চ না হওয়ায় খুব সাবধানে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হয়।

অন্যতম বিশেষ শ্রেণীর ওষুধটির নাম হল অ্যান্টিবায়োটিক। এই অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণত ব্যাক্টেরিয়া জনিত অসুখের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত হয়। সাথে সাথে অপব্যবহারও কম নয়। নির্দিষ্টভাবে সঠিক মাত্রা ও সময়ের সঙ্গে ঠিক কতদিন ধরে তা ব্যবহার করা উচিত তারপর এই ধরনের ওষুধের কার্যকারিতা ও রোগ সেরে ওঠা সাংঘাতিক রকমভাবে নির্ভর করে। সাধারণত দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ৫-৭ দিনের মধ্যেই এই ওষুধগুলির ব্যবহার

সীমাবদ্ধ জনিত কিছু কিছু বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেমন— শরীরের কোনো বড় জয়েন্টে পুঁজ জমা, টিউবারকিউলোসিস, লেপ্রসি ইত্যাদি। সঠিক সময় ধরে না খেলে শুধু রোগ যে সারতে অসুবিধা হবে তা নয়— দীর্ঘ সময় পরে এই অ্যান্টিবায়োটিক তাদের কর্মক্ষমতা হারাবে। ওদিকে ব্যাক্টেরিয়ারা বিভিন্ন মিউটেশান-এর মাধ্যমে তাদের রোগসৃষ্টির ক্ষমতা দিনে দিনে বৃদ্ধি করবে। এ বিষয়ে আগে এই পত্রিকাতেই আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন চিকিৎসকের নির্বন্ধ বা প্রেসক্রিপশন-এর নিরাপদ ব্যবহার নির্ভর করছে বিশেষ কতগুলি বিষয়ের উপর। যা যথাক্রমে— ১) ওষুধের সঠিক মাত্রা, ২) দুপুর বা রাতের সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়া, যেমন— খাবার ১ ঘণ্টা আগে বা পরে ৩) সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়া, ৪) দুটি ওষুধের অন্তর্বর্তীকালীন সময় মেনে ওষুধ খাওয়া, ৫) অনেক সময় একই ওষুধ সারাদিনে মোট কতবার সর্বোচ্চ কত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে তা জেনে নেওয়া, বিশেষত যে ওষুধগুলি প্রয়োজনে ১টি বা ২টি ব্যবহার করতে বলা হয়। যেমন, জ্বর হলে প্যারাসিটামল খেতে নির্দেশ দেওয়া। এক্ষেত্রে জেনে নিতে হবে (বলা ভালো চিকিৎসক বা ফার্মাসিস্টের রুগীকে জানিয়ে দেওয়া উচিত) সারাদিন কত ডোজের ওষুধ সর্বোচ্চ কত মাত্রায় খাওয়া যেতে পারে। একটি ওষুধ খাবার পরে জ্বর না কমলে কি করণীয়। এই ওষুধে কাজ না হলে পরবর্তী কি করা যেতে পারে ইত্যাদি। ৬) কোন অবস্থায় ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে তা জেনে নেওয়া, ৭) গর্ভাবস্থা, শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া। ৮) বিভিন্ন রোগের সমাহার সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অযাচিত ওষুধ ব্যবহার না করা, ৯) ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে অবগত থাকা, ১০) কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

এগুলির বাইরেও নিরাপদ নির্বন্ধের আরো দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক হল— শিশুদের হাতের নাগাল থেকে ওষুধ সামগ্রী দূরে রাখা এবং এক্সপায়ার্ড সিরাপ, সাসপেন্সন, ক্যাপসুল না খেয়ে ফেলা অর্থাৎ ওষুধ কেনার সময় ও খাবার আগে এক্সপায়ারি ডেট দেখে নেওয়া। বিশেষ করে ক্যাপসুল, সিরাপ ও সাসপেন্সন, ইঞ্জেকশন-এর ক্ষেত্রে। কোন কোন মেডিসিন রেফ্রিজেটারের কোন কম্পার্টমেন্ট-এ রাখা উচিত সে সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। যেমন ইনসুলিন সাধারণত রেফ্রিজারেটারের ডিপ ফ্রিজে রাখার দরকার নেই। যাদের বাড়িতে রেফ্রিজারেটার নেই তারা বাড়িতে যেখানে ছায়া থাকে এমন জায়গায় ইনসুলিন রাখতে পারেন। কোন বিশেষ ওষুধে কখনও অ্যালার্জি থাকলে তা চিকিৎসককে জানানো রোগীর কর্তব্য। **উমা**

পরিবেশ ভাবনা থেকে

জলের জীবেরা বলে, কাপড় তো
কাচছো।
আমাদের মেরে ফেলে তুমিও কি
বাঁচছো?

এত জল অপচয়
মোটে ভালো কাজ নয়।

যারা যুদ্ধে যায়
তারা যুদ্ধ চায় না।
যারা যুদ্ধ চায়
তারা যুদ্ধে যায় না।

চাষ করবো গতর খেটে
ঝরিয়ে মাথার ঘাম
আর তুমি কে হে হরিদাস
ঠিক করবে দাম?

বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টল

স্বচিকিৎসা (৬)

বার্ধক্য — তস্য পর্ব ১

গৌতম মিস্ত্রী

পঞ্চাশ-ষাট বছর পেরনোর পরে যৌবনের স্মৃতিতে মোহাবিষ্ট অনেক পুরুষ-নারী একটা মানসিক ধাক্কা খান, কিছু মানুষ শারীরিক ধাক্কাও খান। মনটা সেই পঁচিশ-তিরিশ বছরের ভরা যৌবনের সময়ে আবদ্ধ রাখতে এতদিন অভ্যস্ত ছিল। হঠাৎ মাছের বাজারে পছন্দের তোপসে মাছ পছন্দ করে যেই না বসা অবস্থা থেকে দাঁড়িয়েছেন দরদাম করার জন্য, তখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। তিনি সজ্ঞানে ফিরলে জানতে পারলেন তিনি একটু আগে মাছের বাজারে অজ্ঞান হয়ে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। তার আর সেদিন মাছ কেনা হল না — এক শিশি ডেটল, তুলো আর ব্যান্ডেজ কিনে রিক্সায় চড়ে বাড়ি ফিরলেন। অথবা, এই বছরখানেক আগেও কৃষ্ণনগর স্টেশনে যিনি লোকাল ট্রেন ধরার জন্য এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দুই বা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওভারহেড ব্রিজ দিয়ে অবলীলায় যাতায়াত করতেন, এখন সেটা করতে গেলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কষ্টের উদাহরণের বোঝা না বাড়িয়ে বলা যায়, কিছু শারীরিক কষ্ট একটু অন্যরকমের; অন্যরকম তার কারণ আর তার সমাধান। চেনা রোগের চিকিৎসার জন্য হাজার রকমের ট্যাবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, মলম, করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট ইত্যাদি আছে। সেই চিকিৎসায় রোগের উপশম, রোগমুক্তি ইত্যাদি হলেও কিছু রোগের রোগলক্ষণ সর্বোত্তম চিকিৎসা সত্ত্বেও থেকে যায়। সেটা অবহেলার যোগ্য নয়। সেই রোগের নাম বার্ধক্য। যার সমাধান এখনও কোনও ম্যাজিক ওষুধ আবিষ্কার করা যায় নি। সেই কষ্টের 'না-অসুখ' বা বার্ধক্য মানব শরীরের এক প্রাকৃতিক অমোঘ অবতার। তার নিরাময়ে কোনও ম্যাজিক ট্যাবলেট বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। বার্ধক্য তো আর কোনও রোগ নয়। বার্ধক্য হল অসুখের এক 'না-রোগ-অবতার'— যার ওষুধ নেই। কেমন করে তার মোকাবিলা করা যায়? সেই আলোচনায় কিছুটা সময় ব্যয় করি।

এন্ট্রপি (entropy) - বিশ্বের এক অমোঘ নিয়ম — আমরা যদি এক গ্লাস গরম জল খাবার টেবিলে রেখে একটা সহজ পরীক্ষা করি, প্রয়োজন হলে একটা তাপমান যন্ত্র (থার্মোমিটার) নিয়ে, আমরা দেখব কিছুক্ষণ পরে গরম গ্লাসের জল আর গরম নেই— তার তাপমাত্রা 'না-গরম' করা জলের মতো হয়ে গেছে। অথচ একজন জীবিত মানুষ দার্জিলিঙ, সিমলার অথবা সুইজারল্যান্ডের মতো ঠাণ্ডা জায়গায় বেড়াতে গেলে, আর তার শীতবস্ত্র তেমন কেতার না হলেও মানুষটি যতক্ষণ বেঁচে থাকেন তার শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা (core temperature) স্বাভাবিক থাকে, যেমনটি সমতলের 'না-ঠাণ্ডার' দেশে, তার বাড়িতে ছিল। শীতের দেশে বেড়াতে গেলে তাঁর শরীরের তাপমাত্রা চারপাশের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। আবার অন্য একটা বিষয় এই যে, মানুষ, গরু ছাগল বা যে কোনও প্রাণী, যাদের শরীরের রক্তনালীতে উষ্ণ রক্ত প্রবাহমান তারা মারা গেলে তাদের শরীরের তাপমাত্রা জীবিত অবস্থার মতো মোটেই উষ্ণ থাকে না। মৃত মানুষের তাপমাত্রা মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই মৃতদেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের তাপমাত্রার মতো হয়ে যায় — ঠাণ্ডার দেশে ঠাণ্ডা আর গরমের দেশে গরম। এই ব্যাপারটা প্রথমে উল্লেখ করা গরম জলের গ্লাসের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার মতো। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা মৃত্যুর পরে বজায় থাকে না। মানুষের স্বাভাবিক অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার গড় ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস (সীমা ৩৬.১-৩৭.২)। বিশ্বের নিয়ম এই যে, তাপ বিকিরণ ও অন্যান্য তাপ চলাচলের পদ্ধতির মাধ্যমে গরম বস্তু তাপ বর্জন করে ঠাণ্ডা হতে চায় আর ঠাণ্ডা বস্তু তাপ গ্রহণ করে গরম হতে চায়, যদি না অন্য কোনও ক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। সেই অন্য ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম এন্ট্রপি। ধনাত্মক এন্ট্রপি রক্ষা জীবনের (life-এর) এক অনন্য (unique) বৈশিষ্ট্য। ঋণাত্মক এন্ট্রপির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল থাকা জীবনের এক সংজ্ঞাও বটে। এটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এন্ট্রপি তত্ত্ব অনুযায়ী এই বিশ্বে সকল সজীব ও নির্জীব পদার্থ ক্রমাগত তার অস্থিতাবস্থা (disorder) থেকে স্থিতাবস্থায় (order) পৌঁছতে চায়। একটি সক্রিয় অণুর প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন ক্রমাগত চেষ্টায় থাকে একটা

নিয়মানুগ অস্থির অবস্থান থেকে স্থিতাবস্থায় পৌঁছনোর জন্য। সেই কারণে সূর্যের জ্বালানি হিসাবে অস্থির ও সক্রিয় হাইড্রোজেনের চারটি অণু অপেক্ষাকৃত স্থিত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় একটি হিলিয়াম অণুতে রূপান্তরিত হবার প্রক্রিয়া জারি রাখে— যার ফলে উৎপন্ন শক্তি পৃথিবীতে পৌঁছে পৃথিবীর সজীব ও নির্জীবের টিকে থাকার রসদ জোগায়। বিশ্বের প্রতিটি অস্থির 'পদার্থ-সমষ্টি' বা সিস্টেম— অণু-পরমাণু, সজীব ও নির্জীব পদার্থ— অস্থিতাবস্থা থেকে স্থিতাবস্থায় পরিভ্রমণের প্রচেষ্টায় এই বিশ্ব আমাদের চেতনায় রীতিমত ঘটনাবহুল সক্রিয় পরিমণ্ডল হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি জীবিত প্রাণী নিজ নিজ আয়ু অনুযায়ী, সময়ের মাপে আপেক্ষিকভাবে, ক্ষণকালের জন্য হলেও, জীবিত থাকার প্রচেষ্টা জারি রেখে এন্ট্রপির প্রক্রিয়ার বিপরীতে সক্রিয় থেকে বেঁচে থাকতে চায়, নাচনকোদন করার অবকাশ পায় না।

অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ লুডুইগ বল্টসম্যান (Ludwig Boltzmann) ১৮৭০ সালে এন্ট্রপি ধারণার কথা উল্লেখ করেন। এন্ট্রপি যে কোনো নির্জীব বা সজীব পদার্থ সমষ্টির বা 'সিস্টেমে'র অস্থিতাবস্থার পরিমাপ। যে সিস্টেমের অস্থিতাবস্থা যত বেশি, তার এন্ট্রপি তত বেশি। পদার্থবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী, যে পদার্থ সমষ্টির (সিস্টেম) এন্ট্রপি বেশি সেটা এন্ট্রপি হারিয়ে শূন্য এন্ট্রপিতে বা স্থিতাবস্থায় ফিরে যেতে চায়। সমগ্র জীবিত প্রাণ (উদ্ভিদ ও চরে বেড়ানো প্রাণী) তার অস্থিতাবস্থার রক্ষা করার জন্য, প্রাণীটির শরীরে নিজের শরীরের মধ্যে ঋণাত্মক (ক্ষয় হয়ে যাওয়া) এন্ট্রপির বিরুদ্ধের এক বিশেষ ক্রিয়া বা 'জীবিত থাকার' এক প্রক্রিয়া জারি রাখে। যতদিন তার পক্ষে সেটা করা সম্ভব, ততদিন সেই প্রাণ বেঁচে থাকে। যেদিন সেটা সে আর পারে না সেদিন তার মরণ হয়।

বল্টসম্যানের এই ধারণার পিছনে উষ্ণ পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে তাপের প্রবাহের ঘটনার ধারণা কাজ করেছিল। এটা থার্মোডায়নামিক্সের একটা প্রধান সূত্র। এই বিজ্ঞানীর ভাবনাটিকে একজন আইরিশ পদার্থ বিজ্ঞানী এরউন শ্রোডিঙ্গার, যিনি কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবক্তা হিসাবে খ্যাত। ১৯৪৩-এ 'জীবনের অর্থ কী' — 'What is life' নামে তাঁর একটি বই প্রকাশিত হয়, যাতে তার ট্রিনিটি কলেজের একটি ধারাবাহিক বক্তৃতার ক্রম (সিরিজ) সংকলিত হয়েছিল। তার ধারণায় প্রভাবিত হয়ে প্রচুর পদার্থবিজ্ঞানী জীববিজ্ঞানের গবেষণায় উৎসাহিত হন।

সজীব পদার্থের উপরে এন্ট্রপি তত্ত্ব কাজ না করার কোনও কারণ নেই। বাংলায় এন্ট্রপির প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমি বাংলা ভাষায় 'অস্থিতাবস্থার {বা স্থিতাবস্থার, মানে (order) অভাবের} মাপক বলে উল্লেখ করছি। প্রাণীর শরীর সর্বদা সক্রিয় শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া জীবিত প্রাণীর অস্তিত্বের একটি মৌলিক চাহিদা— 'অস্থিতাবস্থা' বজায় রাখার চেষ্টা করে। শীতের দেশে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখার ঘটনাটি মনে করুন। প্রাণের একটা সংজ্ঞা হল সর্বদা জীবনের (life) বৈশিষ্ট্য হিসাবে অস্থিতাবস্থা বজায় রাখা। প্রাণীর মৃত্যুতে শরীর স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীবিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্জীব পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। হেঁটে-চলা, কথা-বলা, দুরূহ চিন্তার অধিকারী মানুষ পরিণত হয় কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম, লোহা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি অজৈব ও কিছু জৈব রাসায়নিকে। অন্যান্য জীবের মতো মানুষের এই এন্ট্রপি হারানোর প্রক্রিয়া যৌবনের পর থেকেই শুরু হয়ে যায়। মাথায় টাক পড়া, চুল পেকে যাওয়া, চামড়া ঝুলে পড়া, হাঁটুতে বাত হওয়া, চোখে চালশে পড়া (presbiopia), হাড়ের ক্যালসিয়াম বেরিয়ে গিয়ে হাড়কে ভঙ্গুর করে দেওয়া, দৌড়তে গেলে হাঁপ ধরা, দাঁত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঋণাত্মক এন্ট্রপির কর্মকাণ্ড মৃত্যুর আগেই শুরু হয়ে যায়। সজীব পদার্থের উপরে ঋণাত্মক এন্ট্রপির ফলাফলে তার মৃত্যুর আগের কিছুকালের শারীরিক (মানসিকও বটে) তথাকথিত অপ্রতিরোধ্য অসুস্থতাকে আমরা বার্ধক্য বলতে পারি। বার্ধক্য এড়ানোর একমাত্র নিশ্চিত উপায় জন্ম না নেওয়া, অথবা অকালমৃত্যুর মতো দুর্ঘটনা ঘটা — যেটা ব্যক্তিগতভাবে কোনো জীবেরই হাতে নেই। কবিগুরুর গানের সুরে, কয়েকটি শব্দ প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে কিঞ্চিৎ পাল্টে বলি— *আছে জন্ম, আছে মৃত্যু — বার্ধক্যও আছে... নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ — সেই পূর্ণতার (শূন্য এন্ট্রপি) পায়ে মন স্থান মাগে...*

প্রতিটি ফুল, ফল, গাছ, কীট-পতঙ্গ, মানুষ সহ সকল জীবিত পদার্থ নিজ নিজ বৃত্তে কাউকে ব্যতিব্যস্ত না করে বেঁচে থেকে তার নিজ নিজ অস্থিতাবস্থা বজায় রাখার চেষ্টা করে যায় তার মরণকাল পর্যন্ত। চতুর্থ মাত্রা সময় বয়ে যায়। সময় অস্থিতাবস্থা থেকে স্থিতের প্রতি ধাবমান, বাকি তিনটি মাত্রাকে নিয়ে। এই প্রচেষ্টায় আজকের ফোটা ফুল

আগামীকাল শুকিয়ে যায়, আজকের তরুণ-তরুণী একদিন এন্ট্রপি হারিয়ে বুড়ো-বুড়ি হল। চোখে চালশে পড়ে, মাথায় টাক পড়ে, দাঁত নড়ে, চামড়া ঝুলে পড়ে। তার শারীরিক আবেদন হারিয়ে যায়, বুভুক্ষু মনে হত-যৌবনা পুরুষ-নারী অতীতকে আলিঙ্গনের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখার সমস্যার কথা মনোবিদরা বলবেন। আমি শারীরিক বার্ধক্যের কথা বলি।

জীবিত পদার্থ যতদিন জীবিত থাকে, মৃত হওয়ার বিরুদ্ধে তার শরীর-মন (মন শরীরেরই ক্রিয়া বটে) জীবনভর সক্রিয় থাকে। অসুখ হলে তো ইমিউনিটি বা নিজস্ব শারীরিক রোগ প্রতিরোধ করার বিষয়টা আমরা অনেকেই জানি। আন্ত্রিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোভিড ১৯ ইত্যাদি অসুখে মানুষের জৈবিক ক্রিয়া (ওষুধপত্রও প্রয়োগ মানুষের মস্তিষ্কের জৈবিক ক্রিয়া অঙ্গ বলা চলে) স্থিতাবস্থার (Negative entropy) বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্থিতাবস্থা বা জীবন রক্ষা করে। আমরা রোগমুক্ত হই। বার্ধক্যের ক্ষেত্রেও অস্থিতাবস্থা রক্ষার ক্রিয়া ক্ষীণ হলেও সক্রিয় থাকে। তবে কিনা রোগ আর বার্ধক্যের মধ্যে একটা স্থূল লক্ষণরেখা আছে।

রোগমুক্ত হওয়া যায় এমন রোগ বলতে এইমাত্র উল্লেখিত নিরাময়যোগ্য সংক্রমণ রোগের কথা বলছি— যেমন আন্ত্রিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গি, নিউমোনিয়া, এনকেফেলাইটিস ইত্যাদি। এই রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বিরল ক্ষেত্রে হয় মারা যান, অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অথবা প্রাকৃতিক নিয়মেই সেরে ওঠেন। সেরে উঠলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান। রোগের রেশ বয়ে বেড়াতে হয় না। একনাগাড়ে জীবনভোর ওষুধ খেতে হয় না। আবার কিছু অনিরাময়যোগ্য রোগ (ক্রনিক ডিজিস — যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ, ধূমপানজনিত শ্বাসকষ্টের রোগ বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিস ইত্যাদি) আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচণ্ড অপ্রীতিকর, শারীরিক জৈবিক ক্রিয়ার রোগ নিরাময়ের অক্ষমতার কারণে আমাদের বুড়ো বয়সে ভোগায়। এই দুই ধরনের অর্থাৎ নিরাময়যোগ্য ও কেবল নিয়ন্ত্রণযোগ্য অনিরাময়যোগ্য রোগভোগের বৃত্তের বাইরে সহজ সরল মলম-ট্যাবলেট-ক্যাপসুল-ইনজেকশন-অপারেশন ইত্যাদি ক্রয়যোগ্য চিকিৎসায় কিছুমাত্র রোগোপশম হয় না এমন কিছু অন্য ধরনের অসুস্থতা অন্যান্য প্রাণী সহ সকল মানুষকে গ্রাস করে তার বৃদ্ধ বয়সে।

বয়স বাড়লে এক সময়ে মৃত্যু নিশ্চিত। সেই মৃত্যু অপঘাতে না হলে (তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি মানুষটি আত্মহত্যা করছেন না) অপ্রতিরোধ্য নেগেটিভ এন্ট্রপির বিরুদ্ধে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সুস্থ থাকার' ক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ড অসফল হলে বুড়ো বয়সে যে সকল রোগভোগ মানুষের শরীরের দখল নেয়, অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগে সেই রোগভোগ কেবল নিয়ন্ত্রণ করা যায়, নিরাময় করা যায় না। এই রোগ শরীরে বাসা না বাঁধার উপায় জানা থাকলেও তার প্রয়োগের অভাবে এই রোগগুলো আমাদের অনেকেরই শরীরকে স্থায়ী রূপে আক্রমণ করে। এই রোগের কয়েকটি উদাহরণ — ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপেশির ধমনি সরু হয়ে যাবার রোগ (ইস্কিমিক হার্ট ডিজিস)। বর্তমান চিকিৎসা পরিষেবার আধুনিকতম প্রযুক্তিতেও এই রোগ সেরে যায় না। সন্দিহান হয়েও আশা রাখি (?) হয়ত উচ্চ মূল্যের ক্রয়যোগ্য চিকিৎসা প্রযুক্তির প্রয়োগে সে সব রোগ ভবিষ্যতে সেরে যাবে। এখনও এই রোগগুলো 'ক্রনিক রোগ' বা অনিরাময়যোগ্য রোগ হিসাবে চিহ্নিত। এখনও পর্যন্ত এই সব অনিরাময়যোগ্য রোগে উন্নততম বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক চিকিৎসায় কেবল রোগের অপ্রীতিকর পরিণতি কিছুটা প্রতিহত করা যাচ্ছে। মানুষটি রোগমুক্ত হতে পারছেন না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কুইনিন ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা তরোয়াল হলে (বেঁচে গেলে পুরো মাত্রায় রোগ নিরাময় হয়), বিভিন্ন অত্যাধুনিক ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রযুক্তি হার্টের রোগের চিকিৎসায় কেবল ঢালস্বরূপ। হার্টের রোগ কেবল নিয়ন্ত্রণ করা যায় মাত্র, সারানো যায় না। এই জন্মে (পরজন্মে বিশ্বাসী মানুষদের বলছি) নশ্বর শরীরে অজীবন রোগ থেকে যায়। এই সমস্ত রোগ এড়িয়ে কোন ভাগ্যবান (?) ব্যক্তি জীবনের রঙ্গমঞ্চে নাচনকোদন করে নাটকের শেষ অঙ্কে নীরোগ শরীর নিয়ে পৌঁছে গেলে তার মৃত্যুর আগে নেগেটিভ এন্ট্রপির খপ্পরে পড়তেই হয়। তখন তাঁকে বার্ধক্য মেনে নিতে হয়। বার্ধক্য থেকে যৌবনে ফেরার উপায় আবিষ্কৃত হবার নয়। ভাগ্যিস নয়। একটা আশার কথা, বার্ধক্যকে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব — বার্ধক্য আর মৃত্যুর সময়টা সংক্ষেপ করা সম্ভব। সেটাই বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গ। বোধগম্য কারণে এই আলোচনা কয়েকটা পর্বে প্রকাশ্য।

উমা

জলঙ্গী নদীর জীর্ণতা

অলোককুমার বিশ্বাস

কৃষ্ণনগর থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণে জলঙ্গী নদী বরাবর যতই যাওয়া যায় ততই জলঙ্গীর দুই পাড়ে অসংখ্য গ্রামগঞ্জ, ছোটবড় নানা জনপদ। দক্ষিণের গ্রামগঞ্জগুলিতে হিন্দু সংখ্যা একটু বেশি। কিন্তু উত্তরের প্রতিটি গ্রামগঞ্জ, জনপদ যেন হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। সেই সংস্কৃতির অন্যতম উদাহরণ হল প্রাণখোলা হাট ও বিভিন্ন সময়ে সংগঠিত মেলা আর গ্রামের কখনও মধ্যবর্তী কখনও শেষ প্রান্তে জলঙ্গীর ধারে ছোট ছোট দোকান। পড়ন্ত বিকেলের সমন্বয়ী আড্ডাখানা, কেনাবেচা, চর্চা চলে ঘরোয়া পরিস্থিতি থেকে রাজ্য-রাজনীতির ছোটবড় বিষয়। জলঙ্গী নদীতীরে সপ্তাহ অন্তে কত অসংখ্য হাট বসে এবং তিথি অনুসারে বসে মেলা। যেগুলি এই দুই পাড়ের জনবসতির আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ গ্রাম্য হাট বা মেলা যেখানে মোটা পুঁজির আদানপ্রদান না চললেও গ্রামবাংলার অল্পপুঁজির অর্থনীতি বহু পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে।

জলঙ্গী নদীর ধারে অশ্বক্ষুরাকৃতি চিহ্নের পাশে একটি ছোট জনপদ— পণ্ডিতপুর গ্রাম। এখানে নদীর দুটি বাঁক এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে নদীর জলধারার গতি বেশি থাকলে হয়ত কবেই বাঁক দুটি কেটে, দুটির মিলন ঘটত। কিন্তু জলঙ্গী এখন স্থবিরা, বদ্ধ সলিলা। তাই নদীর বাঁক কেটে মিলন হয়ত কোনদিন হবে না। এক সময় এই গ্রামে খুব ঘটা করে গঙ্গা পূজা হত। গঙ্গা পূজা উপলক্ষে গ্রামে দূর-দূরান্তের আত্মীয় স্বজনের জমায়েত হত। এখনো গ্রামে কিছু মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। এদের একজন বিকু হালদার জানালেন — একসময় মা গঙ্গা আসতেন ঘোলা জলের সম্ভার নিয়ে। আমরা বুঝতাম মা গঙ্গা ঘোলা জলের সঙ্গে মাছ নিয়ে এসেছেন। আমরা আনন্দ সহকারে মায়ের পূজা করতাম। এখন মা গঙ্গা ঘোলা জলও নিয়ে আসেন না, মাছও নিয়ে আসেন না। তাই এখন পূজাও হয় না। সেই কবে আমাদের চিরাচরিত পেশা মাছধরা শেষ হয়েছে। এখন আমরা বেশিরভাগই কেউ হাটে সবজি বিক্রিকরি। রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে রাজমিস্ত্রির কাজ করি। আমাদের মতো কত জলঙ্গীপাড়ের গ্রামের পাড়া আছে যেখানে জেলেরা বাস করত। জলঙ্গী নদী তার চলমান জলধারা হারিয়ে ফেলায়, তাদের অবস্থাও আমাদেরই মতো। যে নদী মা, মায়ের মতো একসময় আমাদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখত সেও আর গতিময় নেই, নদীতে মাছও নেই। আমাদের পেশাও নেই। অবশ্য নেই বললে ভুল হবে, কারণ এখনো যেখানে জলঙ্গী কিছুটা হলেও হৃষ্টপুষ্ট অবস্থা আছে সেখানে জলঙ্গী সরকারের কাছে, সরকারের থেকে অর্থবানদের হাতে তারপর আমাদের মতো জেলেদের দিনমজুরিতে সেই মাছ ধরা। যে মাছ ধরা আমাদের বংশগত এবং অবাধ পেশা ছিল সেই পেশা কোথায় হারিয়ে গেছে।

একদা করিমপুরের জলঙ্গীর ঘাটে ছটপূজা হত। এখন জলের অভাবে আর পূজা হয় না। কেন হয় না? কারণ নদীকে আজ বেঁধে ফেলে আটকে দেওয়া হচ্ছে। জলঙ্গী নদীর ওপর নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। একদিকে কাটা হচ্ছে মাটি আর অন্য দিকে নদীকে বেঁধে ফেলে সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। যেমন কৃষ্ণনগরের রেল ব্রিজ। এই ব্রিজ করার ফলে কৃষক হরিপদ দাস দুঃখের সাথে বলেন, আমার আমবাগান আজ জলঙ্গী নদীর ভাঙনে নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। যদি ব্রিজের নতুন পিলারটা পুরনো পিলারের মতো হত তবে এইভাবে আমার জমি জলঙ্গী গর্ভে তলিয়ে যেত না। হরিপদ দাস জন্ম থেকে নদী দেখে আসছে, তাই সে নিরক্ষর হলেও নদী ও তার ভাঙ্গা-গড়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

নদীর উৎসমুখ যখন ঘোর সমস্যা জর্জরিত, তখন নিম্নবাহ কি হবে! ভৈরব-জলঙ্গী মিলনস্থলের কিছু দূরে মোক্তারপুরে ভেলানগর ফেরিঘাট। জমিদারি আমল থেকে যে ঘাটে অমূল্য মাঝিরা কয়েক পুরুষ ধরে পারানির কাজ করত। একসময় নদীতে অনেক জল থাকত; দাঁড়, পাল, বৈঠা বেয়ে নৌকা পারাপর করত। সে সব অতীত। এখন প্রতি বছর ঘাট বরাবর দুদিক থেকে ট্রাক্টরে মাটি ফেলে ঘাটকে সংকুচিত করার চেষ্টা। নদী থেকেই মাটি কেটে এনে নদীর ঘাটের দুদিকে ফেলে নদীকে ছোট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, কারণ তাহলে ঘাট থাকবে কিন্তু পারাপারের দীর্ঘতা

(নদী দীর্ঘতা) কমবে, খরচ কমে আয় বাড়বে ঘাট ক্রেতাদের। ভেলানগরে জলঙ্গী নদীর যা প্রশস্ততা তাতে তাকে বেঁধে ফেলতে খুব বেশি মাটির দরকার হয় না। যেটা সহজেই করে ফেলা যায়। কিন্তু ঘাট তো রাখতেই হবে।

নদীয়া জেলাতে জলঙ্গী তীরে গড়ে ওঠা ইটভাটাগুলি নদী মধ্যবর্তী স্থান থেকে মাটি না কেটে পাড় থেকে কাটতে চায়। কারণ তাতে খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নদী বর্ষার সময়ে জলে ভরপুর হয়ে যায় আবার বর্ষার শেষে জল কমার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পাড়ের ভাঙ্গন। এতে নদী পাড়ের চাষীরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন স্থানে নদী ভাঙ্গনে অনেক জমি নদী গর্ভে তলিয়ে যায়।

দিন দিন চুরির ধরণ পাল্টাচ্ছে। নদী, যা প্রকৃতির দান তাও চুরি যাচ্ছে। করিমপুর-১ এবং ২ ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় নদীতে জল না থাকায় নদীর পাড় বরাবর যাদের জমি তারা জমিকে বাড়িয়ে চলেছে নদী দখল করে। অবশ্য এই বাড়িয়ে চলা তাদের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে যারা পেশি শক্তি, রাজনৈতিক শক্তি আর আর্থিক শক্তিতে বলিয়ান। কোথাও পুকুর ভরাট করতে গিয়ে নদী থেকে মাটি তুলে নদীকে আবার পুকুরে পরিণত করা হচ্ছে। এইরকম পুকুরও করিমপুর ব্লকে দেখা যায়।

কবির ভাষায়— 'ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা'— এই কাব্যিক বিষয়টি জলঙ্গী নদীর বাস্তবের সাথে মেলে না। নদী চাইলেই বইতে পারে না। তার গতি রুদ্ধ করা হয়। চাইলে তাকে চাষের জমি বানানো যায়, চাইলে তাকে পুকুর বানানো যায়, চাইলে তাকে বিক্রিও করা যায়। মুর্শিদাবাদের নওদা ব্লকের একটি গ্রাম —টুঙ্গি। ধীরেন হালদার কয়েক পুরুষ ধরে জলঙ্গী নদীতে মাছ ধরে সংসার চালাত। এখনও চালায় তবে তার ধরণ পাল্টেছে। এখন নদী পুঁজিপতি মালিকের, সরকার বাহাদুর দাম হেঁকে নির্দিষ্ট জলপূর্ণ এলাকার নদী বিক্রি করে দেয়। বিক্রি বললে বোধহয় ভুল হবে, সরকার বাহাদুর লিজ দেয়। সেটাও বিক্রির নামান্তর বলা যায়। কারণ একবার যিনি লিজ নেন তিনিই ক্রমান্বয়ে লিজ নিতে থাকেন। একবার লিজ নেবার হাত ধরে সে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় চলে আসে আর লিজ নামান্তর হয়ে যায় বিক্রিতে। জাল যার, মাছ তার— এখন আর এই ধারণাই নেই। নদীও বিক্রি হয়ে যায়। তাই সেই নদী কেনা বা লিজ নেওয়ার মতো অর্থবল সাধারণ জেলেদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই তারা দিনভিত্তিক মাছ ধরা শ্রমিকের কাজ করে। এইভাবেই তাদের জীবনে আর্থিক পরিবর্তন আসে। আসে দাসত্বের নতুন আঙ্গিক। এক সময় যে নদী তাদের দখলে ছিল, আজ সেই নদী মালিকের অধীন। আবার বিস্ময়ের সাথে এটাও লক্ষণীয় যে মালিকপক্ষ বা যিনি লিজ নিচ্ছেন তিনি জেলেদের থেকেই জেনে নিচ্ছেন কিভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় গাছের ডাল ফেলে, বানা দিয়ে ঘিরে, মশারি বানানো নেট দিয়ে মাছকে আটকে রাখা যায়। কিভাবে কখন মাছের পোনা ছাড়তে হবে, কিভাবে তার লালনপালন করতে হবে। কিন্তু কখন মাছকে বাজারজাত করতে হবে সেটা ঠিক করবে লিজ নেওয়া মহাজন আর মাছ আড়তের আড়তদার। জেলের জাল, মাছ ধরে জেলে, কিন্তু মাছ মালিকের। জেলে টাকার বিনিময়ে মাছ ধরা শ্রমিক। মাছকে ঘিরতে গিয়ে নদীকেই অবরুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এইরকম ভেরি বা নদী জলবাঁধ নদীয়া জেলার উত্তর সীমান্তের জলঙ্গী নদীতে দেখা যায়।

জলঙ্গী নদী, নদী পাড়ের মানুষের অর্থনৈতিক স্বপ্নকে পূরণ করার মাধ্যম ছিল। দুর্গাপূজার আগে করিমপুর, নাজিরপুর, বেতাই, তেহট্ট, চাপড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে মহাজনেরা লক্ষ লক্ষ কাঁচা বাঁশ সংগ্রহ করত। যেগুলি তিলোত্তমা কলকাতার সুউচ্চ, সুবৃহৎ, সুসজ্জিত মণ্ডপ বা প্যান্ডেল তৈরিতে কাজে লাগে আর কুমোরটুলির প্রতিমা কারিগরদের প্রতিমার কাঠামো তৈরিতে কাজে লাগে। এই সংগৃহীত বাঁশ কলকাতায় আনতে বেশ কিছু লোকের সাহায্য লাগে। নদীপাড়ের লোক যারা জলঙ্গী নদী সম্পর্কে জানে তাদেরকেই মহাজনেরা এই দায়িত্ব দিত। কয়েক হাজার বাঁশ দিয়ে বড় ভেলা তৈরি করে, তার উপর মাসখানেক সংসার পেতে কলকাতায় পৌঁছে যেত কিছু লোক। ঋতু অনুযায়ী জলঙ্গীপাড়ের বাসিন্দাদের আয়ের উৎস ছিল জলঙ্গী নদী। সেই নদী আছে, শুধু নেই তার স্রোত। তাই ঋতু অনুযায়ী তাদের আয় আর কিছু নেই। এখনো দুর্গাপুজোর আগে উক্ত অঞ্চলগুলি থেকে কলকাতায় বাঁশ আনা হয়, কিন্তু জলঙ্গী পথে নয়, যায় সড়ক পথে। তাই তাদের আক্ষেপ— নদী তুমি হারিয়ে গেছ, সেই সঙ্গে আমাদেরও আর্থিকভাবে পঙ্গু করেছ।

যে জলঙ্গী নদী সম্পর্কে এহেন অবস্থার কথা আলোচনা করলাম সে নদী এরকম ছিল না। রেনল সাহেব বঙ্গের ৮টি জলপথের কথা বলেছেন— বাংলার অন্তর্দেশীয় জলপথ

বানা : বাঁশের পাতলা সরু চটা দিয়ে প্রস্তুত মাছ আটকানোর বেড়া।

কলকাতার সঙ্গে ঢাকা, দিনাজপুর ও রংপুরের সংযোগকারী হিসাবে ব্যবহার হত। এই পথগুলি হল--- জলঙ্গী, সুন্দরবনাঞ্চল, বেলেঘাটা ও চিচুন্দি খাড়িগুলি দিয়ে ঢাকা অভিমুখে আর টাঙ্গন ও জাফরগঞ্জ দিয়ে দিনাজপুরের পথে যেত। স্বভাবতই নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যকে লক্ষ্য করলেই সেই সময়কার নদীর অবস্থাকে বোঝায়। ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'Trades of Bengal by River and Calcutta by all route' রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Nadia Rivers-এর মধ্যে ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা দিয়ে কলকাতা, বিহার, দক্ষিণপূর্ব উত্তরবঙ্গ, গাজিপুর ও গোরক্ষপুর-এ বাণিজ্য চলত। এই তিন নদীর মধ্যে জলঙ্গী নদী ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। নদীয়া রিভার্সের তিনটি নদীতে যা বাণিজ্য হত, তার অর্ধেক বাণিজ্য হত জলঙ্গী নদী পথে। জলঙ্গীর উজানে বা আপ স্ট্রিমের দিকে যাওয়া বাণিজ্যিক উপাদানগুলি ছিল — কয়লা, সুতিবস্ত্র, গবাদি পশুর খাবার উপকরণ— ফল, সবজি, পাট, বিভিন্ন প্রকার তেল, তৈল বীজ, শুকনো ফল, বাদাম, ঘি, লবণ, সিল্ক, তামা, লোহা, স্টিল, চিনি, তামাক, কাঠ ইত্যাদি। আর জলঙ্গীর ভাটির বা ডাউন স্ট্রিমের দিকে বাণিজ্যিক পণ্যগুলি ছিল চাল, গম, চিনি, তেল, কাঠ ইত্যাদি। 'নদীয়া রিভার্স'-এর পথে আমদানি ও রপ্তানির মোট পণ্য ছিল যথাক্রমে ১৮৯৮-৯৯, ১৮৯৯-১৯০০ এবং ১৯০০-১৯০১ সালে ৮,৪৬,১৩৪ মণ ও ৫১,১৮,৯০১ মণ — যার আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ১,৫১,৭১,৩৮০ টাকা, ১,৮২,৯২,৫১৭ টাকা এবং ১,০৮,৬০,২৮৫ টাকা। তবে উক্ত তিন বছর জলঙ্গী নদীতে উজানে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,১৬৩,৮৯১ মণ, ২,০৬,০০৩ মণ, ১,৬৯,৮,৩২০ মণ। জলঙ্গী নদীতে নৌ পরিবহনের এই চিত্র থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, জলঙ্গী নদী একসময় নৌ-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। এই সময় জলঙ্গী নদীপথ পাটকেবাড়ি, গোবিন্দপুর, কুলগাছি, হাতিশালা, আন্দুলিয়া, পণ্ডিতপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত।[১] আর আজ ছিন্নভিন্ন, স্তব্ধ, স্থবিরা, বদ্ধসলিলা জলঙ্গী হারিয়ে যাওয়া এক ভিন্ন জলঙ্গী।

তথ্যসূত্র:

১. Trades of Bengal by River & of Calcutta by all rules: Govt. of Bengal, Calcutta, pp. 1-4.
২. ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য।

উমা

কোন রাস্তা নেব আমরা?

সুদেষ্ণা ঘোষ

মাথায় লাল রঙের টুপি পরে হাসিমুখে মমতাজ এগিয়ে এল। 'কেমন আছেন ম্যাম?' কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে গেছি দেখে বলল, স্কুল-এর খ্রিস্টমাস অনুষ্ঠানে সান্তা ক্লস হয়েছিল এবং ছোট বাচ্চাদের উপহারও দিয়েছে। এর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে মনটা আনন্দে ভরে উঠল। মনে পড়ে গেল, কিছু বছর আগে ফতিমার কথা, যে নীল শাড়ি পরে সরস্বতী পুজোতে যোগ দিতে এসেছিল এবং হাসিমুখে লজ্জিত হয়ে বলেছিল বাসন্তী রঙের শাড়ি নেই তাই ...

এই প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক এক ধর্মসভায় জনৈক ধর্মগুরুর জ্বালাময়ী বক্তৃতার কথা মনে পড়ল এবং এই পরস্পরবিরোধী ঘটনাগুলির মধ্যে স্কুল-এর ছাত্রীদের আচরণে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। বুঝলাম ছোটদের কোনো গভীর তত্ত্বকথা পড়তে হয় না। এরা খুব সহজেই মনুষ্য ধর্ম পালন করে আনন্দ পায়, কোনো ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াই।

জন্মসূত্রে হিন্দু হয়েও কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ি নি। আমি কোনো ধর্মগুরু নই, সাধারণ শিক্ষিকা মাত্র। তবে ছোটবেলা থেকে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকেছে ধর্ম, প্রতিদিনের কাজেকর্মে যার প্রকাশ। তাই ছাত্রীদের বুঝতে পারি সহজেই। ওদের মন পরিষ্কার, স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা, সকলের সাথে চলা, সকলকে ভালবাসা, অন্যের আনন্দে আনন্দ পাওয়া— এসব লুপ্তপ্রায় ভাবনা ওদের প্রতিদিনকার জীবনের অঙ্গ, এসব শেখাতে হয় না। এটাই ওদের ধর্ম। হয়তো আমাদেরও?

প্রাচীন গুহামানবের কোনো ধর্ম ছিল না। ধর্ম আধুনিক সমাজের আবিষ্কার। প্রথমে ভাল চিন্তাভাবনা নিয়েই জন্ম ধর্মের, কিন্তু তার বড় হওয়ার পথে বহু 'গুরু' এসে ভেদাভেদ, লোভ, হিংসা, প্রতিযোগিতা এই সবকিছুকে ধর্মের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ করে দিলেন। স্বচ্ছ ধর্ম নদীর মতো সময়ের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে কালো কাদা-মাটি মাখা ঘোলা জলে পরিণত হল। ধর্ম যে জীবনের সঙ্গে জড়িত, প্রতিদিনের জীবনের মধ্যে দিয়েই তার বৃদ্ধি ও বিকাশ এসব মানুষ ভুলে গেল। ধর্মকে গ্রন্থের মধ্যে বন্দি করে নিয়মের বেড়াজালে ঘিরে ফেলা হল এবং সাধারণ মানুষকে শেখান

হল ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে। ধর্মের নামে মানুষ মানুষকে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করল না।

আজকের আধুনিক সমাজেও যে ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষ মানুষকে হত্যা করার কথা বলবে তা দুঃখজনক, লজ্জাজনক। এর নিন্দা করা উচিত, প্রতিবাদ তো বটেই। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম উত্তর প্রদেশের ওই ঘটনার পরেও প্রতিবাদের যে বিশাল ঝড় আশা করেছিলাম, তা ওঠেনি। আমরা উদাসীন হয়ে গেছি, ভুলে গেছি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই পুকুরের জলের উদাহরণ যা দিয়ে সহজভাবে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে সব ধর্মই আসলে এক।

ছোটবেলায় পড়া কাজী নজরুল ইসলাম-এর একটি কবিতার কয়েকটা লাইন মনে গেল —'...হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন, কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার...'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীর মানুষের মহামিলনের তীর্থস্থান, এখানেই আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক-হুনদল-পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হয়েছে। ওদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ আজ সেই ঐতিহ্য হারাতে বসেছে আর আমরা ভারতীয় হয়েও মৌনভাবে আছি ভারতের মৃত্যু অপেক্ষায়।

ভূগোলের শিক্ষিকা আমি। পড়ানোর সময়ে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ছবি যখন দেখি তখন ওই ছোট্ট চোখে না দেখতে পাওয়া নীল বিন্দুটির ক্ষুদ্রতা দেখিয়ে ছাত্রীদের বলি আমরা সকলে ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্র। ওই বিন্দুর মতো পৃথিবীর, একটি ক্ষুদ্র দেশের, অতি ক্ষুদ্র শহরে কিছু ধূলিকণার মতো মানুষ নিজেদের সৃষ্ট ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্য ধর্মের ধূলিকণার মতো মানুষকে মুছে ফেলতে চায় ...এর থেকে হাস্যকর কি হতে পারে? এঁরা গুরু? অন্ধকার থেকে নাকি মানুষকে আলোর পথ দেখাবেন? ধর্ম তো সত্যের পথ দেখায় ঠিক পথ চালিত করে। মনুষ্যত্বই পরম ধর্ম — সেই মনুষ্যত্ব যা অন্যদের ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে শেখায়, জীবন বাঁচাতে শেখায়, কেড়ে নিতে নয়।

ফিরে আসি মমতাজের কথায়। ওর সান্তা ক্লস হওয়া দেখে অবাক হয়েছিলাম কিন্তু তার কারণ ওর ধর্ম নয়, তার কারণ এই ছোট্ট মেয়েটি কিছুদিন আগে নিজের বাবাকে হারিয়েছে। অথচ সেই হারানোর ব্যথাটা মনের মধ্যে রেখে নিজের বোনের সাথে খ্রিস্টমাস-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। ওদের মা ওদের পৌঁছে দিয়ে দুপুরের রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন মুসলিম হয়ে, একটি হিন্দু উদ্যোক্তার স্কুলে, খ্রিস্টান অনুষ্ঠানে উৎসাহের সাথে মেয়েদের যোগ দেয়াতে এনে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে ছোটদের মধ্যে। কারণ এরা ভেদাভেদ শেখে নি। এখনো এদের চালিত করে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসা। এদের জনৈক গুরুদের মতো অহংকার নেই, ক্ষমতা পাবার অভিলাষ নেই।

আমাদের সামনে এখন দুটি উদাহরণ দুটি পথ খুলে দিয়েছে। একদিকে ওই ছোট ছোট ছাত্রী ও তাদের মায়েরা —সাধারণ পরিবারের কিছু মানুষ, অন্যদিকে কিছু সমাজের মাথা যারা নাকি শিক্ষিত মানুষ, সমাজের মাথা, কিছু ক্ষেত্রে দেশের শাসনের ভার যাদের ওপরে ন্যস্ত। একদিকে নিজেদের দুঃখ দূরে ঠেলে রেখে ধূপের মতো অন্যদের মধ্যে আনন্দের সুবাস ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা, অন্যদিকে ধর্মসভা ডেকে, ধর্মের নামে অন্য দেশবাসীর জীবন কেড়ে নেবার চক্রান্তে মানুষকে উৎসাহিত করা। কোন রাস্তা নেব আমরা?

উমা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ এপ্রিল, ২০২২

বরুণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক
উৎস মানুষ

আলোও দূষণ সৃষ্টি করে

নন্দগোপাল পাত্র

আগুন জ্বালাতে শেখা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেই আগুন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলল নতুনত্বের সন্ধানে। কয়েক লক্ষ বছর আগের সে আলো এখন বহু বহু গুণ বেড়েছে। আদিম মানুষ সভ্য হয়েছে। টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৪১) আবিষ্কৃত ইনক্যানডিসেন্ট বাল্ব ১৮৭৯-তে প্রথম জ্বলতে শুরু করার মধ্যে দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল নিউইয়র্ক শহরে। ওই সময় থেকেই বৈদ্যুতিক আলোর নতুন অধ্যায়ের শুরু। আর বর্তমান সময়ে শহরকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলার জন্য কোনও উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না। শহরের আবাসিক বাড়ি, অফিস ভবন, সেতু, ফ্লাইওভার, রাজপথ, হাইওয়ে, সর্বত্র আলোর বন্যা। হাজার হাজার ওয়াটের আলোয় ঝলসে যায় চোখ। বাদ যায় না ছোট জনপদ থেকে গ্রাম। সূর্যাস্তের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত জ্বলছে কৃত্রিম আলো। মুছে যাচ্ছে রাতের অন্ধকার। ফলে সবার অজান্তেই আলোক দূষণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ নাগরিকরা। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শহরাঞ্চলের মানুষ। আলোর প্রভাবে বিভিন্ন রোগ-ব্যধিরও শিকার হচ্ছে মানুষ। তালিকায় রয়েছে মাথাব্যথা, চর্মরোগ, শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ। উবে যাচ্ছে রাতের ঘুম। বাড়ছে মানসিক উদ্বেগ। বিজ্ঞানীদের মতে, রাতে ব্যবহৃত কৃত্রিম আলো বা আর্টিফিসিয়াল লাইট অ্যাট নাইট এবং তার সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় সম্পর্ক, মেলাটোনিনের মতো ঘুমের সহযোগী হরমোনের মাত্রা কমে যাচ্ছে মস্তিষ্ক, রেটিনা, ডিম্বাশয় ও সিরামে। গবেষণায় আগেই জানা গিয়েছে, লাইট এমিটিং ডায়োডের (এলইডি) এই নীল আলো ক্যানসারের অন্যতম নাটের গুরু। এলইডি-র নীল আলোর এই ক্ষতি মানুষের জন্যও একই রকম বিপজ্জনক।

মাত্রাতিরিক্ত আলো যে শুধু মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে তা নয়, প্রকৃতির ভারসাম্যএ নষ্ট করছে। জীবজগতে বেশ কিছু কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যারা পুরোপুরি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। এমনকি, তাদের বাসস্থান এবং খাদ্য উদ্ভিদদের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে আসে। অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের ফুল রাতে ফোটে। রাতের অন্ধকারেই কীটপতঙ্গরা ফুলে গিয়ে বসে এবং সেখান থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। খাবারের টানেই এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ঘুরে বেড়ায়। এর মাধ্যমে তারা অজান্তেই পরাগ সংযোগ ঘটায়। তা থেকেই ওই সব উদ্ভিদের ফল এবং বীজের জন্ম হয়। তাই এ সব উদ্ভিদের বংশ বিস্তারে কীটপতঙ্গরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাছাড়া, কৃত্রিম আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক সময় এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে যে, নিশাচর সব কীটপতঙ্গ রাতে আস্তানা ছেড়ে বেরোতেই ভয় পাচ্ছে। ফলে তারা ফুলে গিয়ে বসতে পারছে না। তার জেরেই এ ধরনের উদ্ভিদের বংশবিস্তার থমকে যাচ্ছে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রভাবে উদ্ভিদের স্টামাটা বা পত্ররন্ধ্রও সারারাত খোলা থাকছে। ফলে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় রস বাষ্প আকারে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাতে জলের অভাব ঘটছে উদ্ভিদের দেহে। আর সেই কারণেও শহরে গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, গাছের মেটাবলিজম চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে 'আলোক দূষণ' নিয়ে গবেষণা তো দূরের কথা, কোনো ভাবনাচিন্তাই শুরু হয় নি। সেই আলো যে দূষণ সৃষ্টি করতে পারে তা নিয়ে বর্তমান সময়ে উপলব্ধি শুরু হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দূষণ নিয়ে লেখালিখি, আলোচনা সভা যেমন হয়, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিশন বা কমিটি। কিন্তু আলোক দূষণ নিয়ে আমাদের কোনো সচেতনতা নেই।

জার্মানির লিবনিজ ইনস্টিটিউট অব ফ্রেশওয়াটার ইকোলজি অ্যান্ড ইনল্যান্ড ফিশারিজের বিজ্ঞানীগণ গবেষণায় দেখিয়েছেন, 'রাতের মাত্রাতিরিক্ত আলোয় প্রাণীজগতের পরিবর্তন খুব বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেশ কিছু প্রাণী দিন ও রাতের পার্থক্য হারিয়ে ফেলছে। যার ফলে জীববৈচিত্র বিপন্ন হয়ে পড়ছে'। উপকূলে সামুদ্রিক কচ্ছপের বাচ্চা চাঁদের আলোয় দিক্‌নির্ণয় করে জলের দিকে এগিয়ে যায়। উজ্জ্বল কৃত্রিম আলোয় কচ্ছপের বাচ্চা দিক ভুলে বিপরীত দিকে চলে যায়, ফলে দিনে সূর্যের তাপ ও জলের অভাবে হাজার হাজার কচ্ছপ মারা যায়। রাতে তীব্র আলোর ঝলকানিতে পথ হারিয়ে উঁচু বাড়ির জানলার কাচে

ধাক্কা খেয়ে কিছু পাখি মারা যায়।

কিছু প্রজাতির পোকামাকড় চাঁদের আলোয় বা কম আলোয় ঘোরাফেরা করে। অতিরিক্ত আলোয় দিগভ্রান্ত হয়ে যায়। আমরা দেখতেও পাই ওই সকল পোকামাকড় সারা রাত আলোর আশপাশে ঘোরাঘুরির জন্য এবং তাপের প্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তারা যেমন গর্ভধারণের ক্ষমতা হারায়, তেমনই অন্য শিকারি পোকা বা প্রাণীদের শিকার হয়ে যায়। গবেষণা থেকে এও জানা গেছে তীব্র আলোর প্রভাবে ইঁদুর, ছুঁচোসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা বেড়ে যায়। এদের মাথায় থাকা পাইনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটনিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। যার ফলে তাদের প্রজনন ক্ষমতা বেড়ে যায়। বাড়তে থাকে ইঁদুরের সংখ্যা। ন্যাশনাল ওসেনিক অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাসোসিয়েশন-এর তথ্য জানাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে নাইট্রেট মূলক তৈরি বাধাপ্রাপ্ত হয় আলোক দূষণের জন্য। নাইট্রেট মূলক পরিবেশবান্ধব। এটি যেমন গাড়ির ও কলকারখানার ক্ষতিকর নিঃসরণের প্রভাব কমায়, তেমনই ধোঁয়াশা (smog) তৈরি কমায়, ওজোন দূষণ সহ আরও বিভিন্ন ক্ষতিকর কণার প্রভাব হ্রাস করে। এই নাইট্রেট মূলক দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় ভেঙ্গে যায়। মাত্রাতিরিক্ত রাতের আলোয় নাইট্রেট মূলক ভেঙ্গে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রাকৃতিক বায়ুশোধন প্রক্রিয়া। এক কথায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোর দূষণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

শহরে কোথায় কত আলো বসবে সে ব্যাপারে শেষকথা সাধারণত বলেন নির্বাচিত কাউন্সিলর অথবা মেয়র পারিষদরা। তাঁদের ইচ্ছা মেনে শহরে একের পর আলো লাগানো হয়। দেখা যায় রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানেও আলো বসাতে হয়। কৃত্রিম আলো রাতের অন্ধকার কেড়ে নেওয়ায় শঙ্কিত পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীমহল। বিশ্বের একাধিক দেশ আলোকদূষণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। জানা গেছে পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াতের ঋতুতে টরেন্টো, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনের মতো শহরে রাতের বেলা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আক্ষেপের বিষয় হল আলোর আতিশয্য নিয়ে পরিবেশবিদদের সতর্কবাণী মান্যতা পায় না। এবার কিন্তু সময় এসেছে অকারণে আলোর ব্যবহার নিয়ে সব স্তরে সতর্ক হওয়ার।

উমা

অতিমারী, অবসাদ এবং মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য

শ্রীতন্বী চক্রবর্তী

২০২০ সালের ৩ এপ্রিল বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায়ের অতিমারী, লকডাউন এবং ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ফাইনান্সিয়াল টাইমস'-এ। সমগ্র মানবজাতির বিপদসংকুল অবস্থা, রাজনৈতিক পর্যালোচনা ছাড়াও এই লেখায় উঠে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— 'And even while the virus proliferates, who could not be thrilled by the swell of birdsong in cities, peacocks dancing at traffic crossings and the silence in the skies?' (Roy, 2020)

একদিকে যেমন অতিমারীর ভাইরাসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে এক দুর্বার গতিতে, ঠিক অন্যদিকে, লকডাউন ত্বরান্বিত করেছে মানুষের জীবনে কর্মক্ষমতা হ্রাস, মানসিক স্বাস্থ্যের দুর্বলতা এবং ডেকে এনেছে জীবনের পেশাদারি পরিকাঠামোয় কঠিন আঘাত।পুরুষদের সাথেসাথে দেশের বিভিন্ন উন্নত এবং অনুন্নত শাখায় কাজ হারিয়েছেন মহিলারাও। মহিলাদের শারীরিক গঠনতন্ত্র যেমন পুরুষদের থেকে আলাদা, তাদের মানসিক গতি, গঠন উত্তরণ এবং অতিমারী নিয়ে তাদের মানসিক পর্যালোচনাও ঠিক ততটাই অন্যরকম। তারা ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে নিরন্তর লড়াই করছে সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে, মহামারীর শেষে ঘরের আর্থিক পরিকাঠামোটিকে ঠিক রাখার অভিপ্রায়ে। স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গ— যদি এইভাবে দেখি, তাহলে বুঝব এর জৈবিক উৎস থেকে শুরু করে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া প্রতিটিই দুজনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আলাদা কিছু পথ অনুসরণ করে। তাই পুরুষ এবং নারীর মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক অসুস্থতা উভয়ের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই আলোচনায় এক স্বাধীন গুণনীয়ক হচ্ছে তাদের মানসিক সমস্যাগুলিকে আলাদা করে বোঝা।

মহিলাদের শিশুকাল, বয়ঃসন্ধি থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সময়ে বেশ কিছু ক্লিনিকাল প্যাটার্ন এবং অবসাদের তীব্রতা আলাদা, চিকিৎসায় তাদের প্রতিক্রিয়াও আলাদা এবং অবশ্যই রোগ

নির্ণয় এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলেও তারতম্য ঘটে; বর্তমানে কোভিড মহামারী আমাদের বিশ্বব্যাপী প্রভাবিত করেছে। নারী-পুরুষ পার্থক্যটি সামগ্রিকভাবে বোঝার জন্য পরিবেশগত কারণগুলির সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার।

কর্মরতা পদমর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের বিষণ্ণতার দিকটিও দেখা গেছে, বিশেষত কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন তারাই সংসারের মূল উপার্জনকারী। উত্তর কলকাতার বেশ কিছু মহিলা মাছ বিক্রেতা, মুদি দোকানের মহিলা কর্মচারি, চায়ের দোকানের মহিলা কর্ত্রী, স্কুল শিক্ষিকা, প্যারামেডিকেল স্টাফ, সরকারি এবং বেসরকারি কলেজের অধ্যাপিকা, গৃহ-সহায়িকা এবং প্রসাধনসামগ্রীর দোকানের মহিলা কর্মচারি— এরকম বেশ কিছু আর্থ-সামাজিক বলয়ের মহিলাদের সাথে অতিমারীজনিত ডিপ্রেশন, অসহায়তা, অনুচ্চারিত উদ্বেগ, মাতৃত্ব, সংসার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে জানা গেল, ডিপ্রেশনের বিশেষ কয়েকটি কারণ — ১) দৈনন্দিন জীবনযাপনে অতিমারীর ফলে চরম আর্থিক কুপ্রভাব এবং মানসিক দুর্দশা (অতিমাত্রায় সামাজিক মাধ্যমে আসক্তি, অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্ন)। ২) ঘরে এবং ঘরের বাইরে সমানতালে নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকা। নিয়মিত ডেডলাইন, কোনো নির্দিষ্ট কাজের সময় না থাকা এবং উদ্বেগ। ৩) আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোতে মহিলাদের আর্থিক সংস্থান না থাকা, দৈনন্দিন রুজি নিয়ে সমস্যা, ওয়েজ আর্নিং লেবার, বাড়িতে এবং কর্মস্থলে অত্যন্ত সীমিত সমর্থন বেশ কিছু ক্ষেত্রে মহিলাদের আরো বেশি ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যারা আর্থিকভাবে সক্ষম, তাঁরা বাধ্য হয়েছেন মনোবিদের সাহায্য নিতে, কিন্তু যাঁরা সেটা পারেন নি, তাঁরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আত্মহননের মতো চিন্তাও করেছেন বহুবার। ৪) মহিলারা চাকরি বা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ঝুঁকির শিকার হন বেশি; পরিবারে আরও সহায়তার প্রয়োজন হলে বা চাকরি কেবলমাত্র প্রযুক্তি-নির্ভর হলে তাদের চাকরি এবং বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।

অতিমারীকালীন মাতৃত্ব, শিশুর যত্ন, গার্হস্থ্য শ্রম প্রদান এই তিনটির সম্মিলিত রূপ বিষণ্ণতার জন্ম দিচ্ছে। প্রতিনিয়ত নারীচেতনায় প্রতিযোগিতার কঠিনতম ছবিগুলি উঠে আসছে। মহিলাদের জীবনে গর্ভাবস্থা এবং প্রসব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এটি মহিলাদের মধ্যে ক্রমবর্ধিত শারীরিক এবং মানসিক জটিলতারও একটি পরিচিত কারণ। এমনকি একটি সাধারণ পরিস্থিতিতেও এক ঠিকানা থেকে আরেক ঠিকানায় চলাচলের সীমাবদ্ধতা, অহেতুক সামাজিকীকরণ এবং নিয়মিত রুটিন সম্পাদনে অসুবিধার কারণে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। যদিও ২০২০-তে প্রাথমিক সংবাদ প্রতিবেদনগুলি অনুযায়ী, গর্ভাবস্থায় মায়ের কাছ থেকে শিশুর কাছে কোভিড-১৯ কোনও উল্লম্ব সংক্রমণের পক্ষে ছিল না, সাম্প্রতিক গবেষণাগুলি তার ঠিক বিপরীত বলেছে।

কোভিড-১৯-এর সময় মহিলারা স্বাস্থ্যসেবাকর্মী হিসেবেও ফ্রন্টলাইনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং সে ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকির পরিমাণও অনেকটাই বেশি রয়ে গিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত যৌথ সংসারগুলিতেও তাদের সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই রোগটি ঘরে এনে ফেলার ভয় অনেক মহিলাকেই তাদের পরিবার ও শিশুদের থেকে দূরে, তাদের কর্মস্থলে থাকতে বাধ্য করেছে। ফলত, প্রবল হয়েছে ডিপ্রেশনের মাত্রা। স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নার্সরা যারা মহিলাদের প্রয়োজনে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেন এবং সেই কারণে জীবনযাত্রাও পারিবারিক গতিপ্রকৃতির বাইরে গিয়ে অনেকটাই নার্সিংহোম এবং হাসপাতালকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। উত্তর কলকাতার লেকটাউন-এ একটি নার্সিংহোমে কর্মরত নার্স অনিমা হালদারের বিবৃতিতে এই সমস্যার দিকটিই ধরা পড়ে। এর সাথে কিছু কিছু কর্মক্ষেত্রে ডিপ্রেশন এবং মানসিক ব্যাধির অরেকটি কারণ হল 'নো ওয়ার্ক নো পে' মোড।

গার্হস্থ্য হিংসা এবং অতিমারী: মহিলাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার আরেকটি কারণ— অতিমারীর কারণে চাকরির ক্ষতি এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সমস্ত জাতি এবং বর্ণের মহিলাদের মধ্যেই, ভাইরাসের বিস্তারকে মোকাবিলা করার জন্য যে জনস্বাস্থ্য বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সেগুলিও ঠিকঠাক বিকল্প হিসেবে অনেক সময়ই অনর্থক প্রমাণ হয়েছে। বস্তি থেকে বহুতল, গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন বহু মহিলাই। মহিলা আশ্রয়কেন্দ্র এবং হোটেলগুলি তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি নিরাপদ আশ্রয়ে মানুষের প্রবেশাধিকারকে সীমিত করেছে।

কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল নামক একটি সংস্থার করা সারভে অনুযায়ী অতিমারীজনিত কারণে প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বেগ ও মানসিক অবসন্নতায় ভুগছে। উল্লেখযোগ্য মানসিক স্বাস্থ্যের পরিণতি হিসেবে নিরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে পুরুষদের থেকে

মহিলারা প্রায় তিনগুণ বেশি অবসাদ ভোগ করছেন। সারভেটিতে এও দেখা গেছে যে সারা বিশ্বে ২৭ শতাংশ নারী উদ্বেগ, ক্ষুধা হ্রাস, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদির কথা বলেছেন। অতএব, আমাদের আশেপাশে অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের খতিয়ানও যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখাত পাই ২০২০ এবং ২০২১— অতিমারীর এই সঙ্কট মহিলাদের অবসাদের এক প্রধান কারণ। এমনকি, বয়স্ক মহিলারা নিজেদের প্রায় সমস্ত সামাজিকতা থেকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখছেন। বারবার সতর্কতা, কোভিড-১৯ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হলে অসহায়ত্ব ও উদ্বেগের বোধ মহিলাদের মধ্যে অনেকটাই বৃদ্ধি করেছে। সম্ভাব্য মারাত্মক জটিলতার ক্ষেত্রটি তৈরি করে দিয়েছে যোগাযোগের মাধ্যম এবং রেডিও/টেলিভিশন অন্যান্য চ্যানেলের মাধ্যমে এই সতর্কতার প্রচার। প্রবীণরা, যাঁরা কোনো যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে থাকেন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই এই সঙ্কট মোকাবিলায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমর্থন পেতে পারেন। কিন্তু যে প্রবীণ মহিলারা একা থাকেন তাঁদের অবসাদ, দুশ্চিন্তা এবং সংক্রমণ থেকে জীবনহানির ভয় অনেক বেশি। ভারতে একা বসবাস করা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অতিমারীজনিত অবসাদ। সন্তানরা অন্য কোনও শহরে চলে গেছে বা অন্য দেশে চলে গেছে। এই প্রাপ্তবয়স্করা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য এবং বাড়ির স্বাস্থ্যসেবার জন্য তাদের আশেপাশের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর অথবা ভাড়া নেওয়া গৃহ সহায়কদের সাহায্যে বেঁচে থাকে। লকডাউন শুরু হওয়ার পরে, প্রাপ্তবয়স্করা অনেক বাধার সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রে এও দেখা গিয়েছে যে, চব্বিশ ঘণ্টার গৃহকর্মী কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়স্কদের সহায়তা করতে সক্ষম হন নি এবং লকডাউন শুরু হবার পর, রান্না করা খাবার সরবরাহ করা একদমই সহজ ছিল না।

ভারতে অনেকেরই মানসিক অসুস্থতা সম্পর্কে দ্বিচারিতা, আত্মপ্রহসনের একটি জায়গা রয়েছে এবং অনেকে আবার নিজেরাই কোনো ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াই বিকল্প প্রতিকার নিতে পছন্দ করেন। লকডাউন এবং অতিমারী চলাকালীন একাধিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেলিব্রিটিদের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচার হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া, স্মার্টফোন ব্যবহার এবং মহিলাদের অবসাদ — স্মার্টফোন ব্যবহার, একাকীত্ব এবং মহিলাদের মধ্যে অতিমারীজনিত অবসাদ বিষয়ে একটি গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করা প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করা স্ব-সংবাদিত সুখ, জীবনের তৃপ্তি এবং আত্মমর্যাদাবোধের সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। অনস্ক্রিন কার্যকলাপে ব্যয় করা সময় (ব্যক্তি-সামাজিক যোগাযোগ, খেলাধুলা বা অনুশীলন, প্রিন্ট মিডিয়া, হোমওয়ার্ক, ধর্মীয় পরিষেবাগুলি দেখা, বেতনভুক্ত চাকরিতে কাজ করা নিয়ে আলোচনা) কিশোরীদের মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতার সাথেও আপস করে। ফেসবুক, টুইটার, ইন্সট্রাগাম এবং আরো বেশ কয়েকটি আন্তর্জালিক সামাজিক মাধ্যম বিভিন্নভাবে মেয়েদের/বয়ঃসন্ধিকালের মহিলাদের অস্থিরতা, সাইবারবুলিং, অনিদ্রা এবং হীনমন্যতায় ভুগিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সোশ্যাল সাইকিয়াট্রি-র (৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ অনুযায়ী, করোনাভাইরাস রোগের সাইকোসোশ্যাল প্রশাখাগুলি মহিলাদের মধ্যে শরীর নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। লকডাউন চলাকালীন সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপোজার, ওজন বাড়ানোর মিম্‌স সুন্দর/সুন্দরী দেখতে লাগা নিয়ে সমবয়সী গোষ্ঠীদের মধ্যে কথোপকথনের মতো বিষয়গুলি মহিলাদের মধ্যে দেহের অসন্তুষ্টি নির্ধারণে 'ফ্যাট টক'ও সামাজিক প্রভাবের অবদান পরীক্ষা করা হয়েছিল।

মহামারী, লকডাউন এবং অবসাদ এই তিনের যাঁতাকল মানুষের জীবনে অভাবনীয় দুর্যোগ ডেকে এনেছে। ল্যাটিন আমেরিকান ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ ১৯৮৮ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ''Plagues are like imponderable dangers that surprise people. They seem to have a quality of destiny'' (উপলক্ষ: তাঁর Love in the time of cholera উপন্যাসটি)। ভবিষ্যতে এমন কোনোদিন হয়ত আসবে যখন অতিমারী অতিক্রম করেও মানুষ খুঁজে পাবে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস। অরুন্ধতী রায়ের বলা কথাগুলোর মতোই রোমাঞ্চিত হবে পাখির ডাকে, ময়ূরের নৃত্যের তালে, আকাশে উড়বে একঝাঁক ইচ্ছেডানা।

তথ্যঋণ:

1) Roy, Arundhati. "The Pandemic is a Portal". Financial Times, 3 April, 2020

2. Ahuja, Kanika K.,et al. 'Weighty Woes': Impact of Fat Talk and Social Influences on Body Dissatisfaction among Indian Women during the Pandemic. International Journal of Social Psychiatry, 2021, p. 002076402199281. Crossref, doi: 10.1177/0020764021992814.

উমা

দ্য পার্সোনাল ইজ পলিটিকাল : লিঙ্গ রাজনীতি ও ভারতীয় পুরুষ

রূপক বর্ধন রায়

বিগত এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বহুল আলোচিত একটি বিষয় নিয়ে লিখতে বসার অভ্যন্তরীণ সমস্যা বিস্তর। নানান প্রশ্ন চাগাড় দেয়— যার বেশিরভাগই ন্যায্য। এমন স্থানকালীন অন্তরায় অতিক্রম করে সঠিক বিষয়বস্তু অবধি পৌঁছতেই আমার মতো অর্বাচীনের কালঘাম ছুটবে সেটাই স্বাভাবিক। তবুও বিগত কয়েক বছর ধরে এমনই বেশ কিছু ডিস্কোর্সকে বার বার ফিরে দেখার মতো বোকা ও অবাধ্য কাজটা আমি সময়-অসময়ে করেই এসেছি— বর্তমান নিবন্ধটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের প্রয়োজীনয় কাজটা সেরে ফেলার পর, এবার মূল কথায় আসি।

২০২০ সালের শুরুর দিকে বঙ্গসংস্কৃতি আঙিনার এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বেশ কিছু প্রশ্ন করতে পারার সুযোগ ঘটেছিল। আমি কৃতজ্ঞ অসীম ধৈর্য সহকারে তিনি আমার মূঢ় প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দিয়েছিলেন।

প্র: যদি আমরা হাইপোথেটিক্যালি ধরে নিই যে আমাদের সমাজে সাম্যবাদ আগত, সে ক্ষেত্রে কি আপনি মনে করেন একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি সংসারে পুরুষ ও নারীর খাবারের থালায় একই পৌষ্টিক গুণমানের খাবার পৌঁছতে পারে?

আমার সৌভাগ্য, তার কথার যে সততা অন্যান্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমায় অসীম আনন্দ দিয়েছিল, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

আমাদের ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে যে যেখানে যতই বুক ফুলিয়ে লিঙ্গ সাম্যের কথা বলুন না কেন, বেশিরভাগ ব্যক্তিগত সংসারের দৈনন্দিন আঙিনায় তার ছিটেফোঁটাও যে ২০২১ সালে পৌঁছতে পারে নি সে বড় দুঃখের কথা। এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিতান্ত্রিক সমস্যাটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বই বর্তমান নিবন্ধে আমাদের ডিসকোর্সের দিক নির্ণয় করবে অর্থাৎ আমরা কথা বলব লিঙ্গ রাজনীতির একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে। সে কথায় আসব, তবে তার আগে আর দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, আমার ব্যক্তিগত মতে, এই একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামকে কেবল অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে তুল্যমূল্য মাপজোক করার প্রবণতায় একটা বিরাট সহজাত গলতি আছে। আধুনিক পোস্টমডার্ন যাপনে, শ্রেণী দুরকম — প্রথমটি শোষিত শ্রেণী এবং দ্বিতীয়টি শোষক। আমার হাইপোথেটিকাল প্রশ্নের মূল কথাটি ছিল এইটিই। কাজেই তাত্ত্বিক পরিগ্রহে সাম্যবাদ আগত হলে, তাতে মুনাফা বন্টনের সমস্যা অর্থনৈতিক স্তরে খানিকটা মিটলেও অন্যান্য সামাজিক আঙিনায় তা থেকেই যায়। অর্থাৎ মানব সমাজে লিঙ্গকে বাদ রেখে সাম্য আনা অসম্ভব।

সমাজের শ্রেণীগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বন্টনের ভিত্তিতে দেখতে যাওয়া পোস্টমডার্ন সমাজে মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি অভ্যন্তরীণ অক্ষমতা --- এক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল আমরা মনে করি নারীবাদ পশ্চিম থেকে আগত একটি ধারণা।

দ্বিতীয়ত, আমার তরফে আরেকটি কথা আপনাদের কাছে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৭০ সালের গ্রীসে রোপন হওয়া পশ্চিমী নারীবাদের বীজ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রথম তরঙ্গে ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে অঙ্কুরিত হয়। এরপর বিংশ শতাব্দীর ৬০-৭০ দশকে সিমন দে বোভোয়া ও মোনিক উইটিগের মতো তাত্ত্বিক তথা অ্যাক্টিভিস্টদের অভিজ্ঞ নেতৃত্বে নানান রাজনৈতিক শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়া নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ আধুনিক মহিলাদের এনে দিয়েছিল রাজনৈতিক, বৈবাহিক ও যৌন স্বাধীনতা। বিগত দুই দশকের বেশি সময়ে লিঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে— যেখানে পুরুষ-নারী এই বিভাজনের

রেখাটি আরো নানান শাখায় বিস্তারিত হয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে প্রচারের আলোয় আমরা একটি একত্রিত LGBTQ সমাজকে দ্যুতিমান হতে দেখি। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক পৃথিবীতে নারীবাদী সংগ্রাম লিঙ্গ সমতার আন্দোলন ও অস্থিরতায় বিকশিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনার সরলতা ও কন্টিনিউটি বজায় রাখার তাগিদে এবং অবশ্যই খানিকটা নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অপূর্ণতাকে ঢেকে রাখার তাগিদেও পুরুষ-নারী সম্পর্কিত সমস্যাকেই আমি উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করব। হে সর্বজ্ঞ পাঠক, আশা করি আপনাদের চোখে এই ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আমরা ধরে নেব বর্তমানে আলোচিত কথাগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে বিবর্তনগামী এক একান্নবর্তী লিঙ্গ সমস্যার কিছু বিশিষ্ট উদাহরণ মাত্র।

এইবার কাজের কথায় আসি। মল্লিকা সেনগুপ্তর একটি কথা আমার বড় পছন্দের: 'পুরুষ নয়, মেয়েদের আসল শত্রু পুরুষতন্ত্র। পুরুষকে সঙ্গী করেই পুরুষতন্ত্রে বিরুদ্ধে লড়তে হবে তাদের। ... পুরুষতন্ত্রে বিরুদ্ধে এ লড়াই নারী ও পুরুষ উভয়েরই।'

আমাদের দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরুষের সামাজিক অবদান ও দৃষ্টিকোণ নিয়ে বড় একটা আলোচনা আমরা কিন্তু হতে দেখি না। যা বলতে চাইছি তা হল, যে পুরুষ নিজেই পুরুষতান্ত্রিক তাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া হবে সে তো স্বাভাবিক। আবার অন্যদিকে এমন বহু পুরুষ রয়েছেন যারা লিঙ্গ-অসাম্যের উপস্থিতিকে কবুল করেন এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়ক্ষেত্রেই নিজের মতো করে সে সমস্যা সামলে ওঠার চেষ্টাও করেন। এই দুই পুরুষ যাই করুন, তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বা সুখকর হোক তা স্বচ্ছ। কিন্তু সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে অন্য এক জায়গায়। যে পুরুষ সামাজিক আঙিনায় খোলাখুলি লিঙ্গসাম্যের কথা বুক ফুলিয়ে বলছেন তারা সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্তরে সততই সাম্যবাদী তো? ধরা যাকে একটি সাম্যবাদী মিছিলে যে মানুষটির গরমাগরম বক্তৃতায় আকুল হয়ে তাকে সারা জীবনের সঙ্গী করার কথা ভেবে বসলেন দেখা গেল একত্র জীবনের শুরুর দিন থেকেই বেড়ালের নখ বেরিয়ে পড়েছে। সে ক্ষেত্রে? সমস্যাটা এইখানে — অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত অনুশীলনের ফাঁক। আমাদের চেষ্টা হবে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চের নিরিখে এই সমস্যার একটি নামকরণ করা, ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে যদি সম্ভব হয় একটি সমাধানের দিক নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। আন্তর্জাতিক স্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো খানিকটা পরিষ্কার হবে।

বিগত শতাব্দীর দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিখ্যাত গদ্যকার বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গদ্য শৈলীর প্রশ্নাতীত সম্রাট বলে মনে করি। সার্কাজম, বুদ্ধিমত্তা, বৈজ্ঞানিক মেজাজ এবং পাণ্ডিত্য পরিবেষ্টিত গদ্য রচনার ক্ষেত্রে আর একটি মাত্র মানুষের রচনাকেই আমার রাসেলের সমতুল্য বলে মনে হয় — তাঁর নাম রাজশেখর বসু। প্রথম প্রথম রাসেল পড়তে বসে তাঁর স্রোতস্বিনী গদ্যরসে হাবুডুবু খেতে খেতে তাঁর 'মর্টালস অ্যান্ড আদার্স' বইয়ের কয়েকটি পুরুষ-নারী বিষয়ক লেখায় আমার তাক লেগে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এই তো সবশেষে পাওয়া গিয়েছে — অমূল্য রতন। যেমন ধরা যাক ' Our woman haters' প্রবন্ধে রাসেল লিখছেন — 'Why should woman be an ideal to man any more than man to woman?' কিংবা 'Dangers of Feminism' প্রবন্ধে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সারকাজমের মাধ্যমে লিঙ্গ অসাম্যের কঠোর বাস্তবকে বোঝাতে গিয়ে বলছেন— 'Meanwhile, fortunately, men escape these humiliations. What does it matter if women suffer them? After all, they are used to them?'

আবার অন্যদিকে 'Marraige and Morals' এবং আরো নানান লেখায়, খুব সহজেই যখন রাসেল নারীর রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক আত্ম-পূর্ণতা, যৌন স্বাধীনতা ইত্যাদির সপক্ষে নিজের ইতিবাচক মনোভাব পরিষ্কার করে দিচ্ছেন, তৎকালীন সমাজে এই লেখাগুলি যে নারীর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এছাড়া ১৯০৭ সালের উইম্বেলডন বাই-ইলেকশনে মহিলাদের ভোটাধিকারের লক্ষ্যে তার সওয়াল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীপদে লড়ে প্রায় ২৫% ভোট পাওয়ার কথা তো সর্বজনবিদিত। এই অবধি ব্যাপারটা ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু রাসেলের ব্যক্তিগত জীবনে এবং তার সন্তান ক্যাথরিন টেইটের লেখালেখিতে উঁকি মারলেই সমস্যা বাধে। তার বাবার সম্পর্কে ক্যাথরিনের লেখালেখির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'My Father, Bertrand Russell' নামক বইটি। এই নিবন্ধের স্থানকালীন সীমাবদ্ধতায় সে বইয়ের সম্পূর্ণ মূল্যায়নে আমি অপারগ, তাই আমরা ক্যাথরিনের একটি বক্তৃতাকে (Russell and Feminism)

মূলধন করেই আলোচনা করব। উপরোক্ত বক্তৃতায় ক্যাথরিন তার বক্তব্যকে খুব পরিষ্কারভাবে ব্যক্তিগত ও অ-ব্যক্তিগত এই দুইভাবে ভাগ করেছেন। আমরা অ-ব্যক্তিগত দিকটা নিয়ে বেশি আগ্রহী। দেখা যায় যে রাসেল তাঁর প্রথম স্ত্রী অ্যালিস এবং পরবর্তীকালে তার অন্যান্য চার সঙ্গিনীদের যে চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার প্রত্যেকটিতেই ব্যক্তিগত স্তরে উগ্র পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। নিজেদের মধ্যে ঘটে যাওয়া তিক্ত ডিভোর্সের অনেক পরে আমরা ক্যাথরিনের মা ডোরাকে লিখতে দেখি— ''...''....Bertie did not believe in the equality of women and men...he believed the male intellect to be superior to that of the female. He once told me that he usually found it necessary to talk down to women." কিংবা ''Bertie was an old-fashioned husband. ...he did not much explore the inner workings of the female psyche, but would minister to a mind if it bore resemblance to that of superior male..."

যে মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়ে এত ওয়াকিবহাল, তার ব্যক্তিগত জীবনে এত তারতম্য কেন? এমনকি তার লেখালেখি জীবনের সর্বত্র আমরা প্রায়শই একটা উন্নাসিক ঝোঁক দেখতে পাই যেখানে সন্তান মানুষ করার কাজটিকে তিনি তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনেন নি। 'Conquest of Happiness' লেখাটি এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ যার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় লেখক প্রায় স্পষ্ট করেই বলেছেন যে সন্তান মানুষ করার ক্ষেত্রে পিতার তেমন কিছু দেওয়া থাকে না। তাছাড়া লেখাটির সম্বোধন-প্রকৃতি প্রায় খোলাখুলিভাবে পুরুষতান্ত্রিক, যেখানে বেশিরভাগ বাক্যের সম্বোধনেই রাসেল 'the man who...' কথাটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গ যাই হোক, বিগত শতাব্দীর লিঙ্গসাম্যের তথাকথিত প্রতীকের নিজের মানুষ অর্থেই পুরুষ! বইটি সম্বন্ধে ক্যাথরিন যেমন বলেছেন—

'....He does discuss the problems of women, but that discussion is a part of a chapter on the family, and the family is discussed as being necessary to 'man's' happiness...'

এমনই নানান লেখা ও বইপত্র ঘাঁটলে রাসেল সম্বন্ধে যে কোনো শিক্ষিত এবং ওয়াকিবহাল মানুষেরই মনে হবে। '....what matters to him is the male mind. That is what he was really after.'

রাসেলের প্রসঙ্গে বিগত শতাব্দীর পশ্চিমী বিশ্বের যে সমস্যাটি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনার চেষ্টা করা হল, মার্ক্সীয় তত্ত্বে তার গালভরা নাম — ফলস্ কনশাসনেস। রাসেলের ক্ষেত্রে এর জলজ্যান্ত উদাহরণ পাই যেখানে তিনি মহিলাদের ভোটাধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেন, কারণ শ্রেণীর নিরিখে মানুষ হিসাবে তা তাদের অধিকার। কিন্তু একই সময়ে মাতৃত্ব ও মাতৃত্বজনিত অন্যান্য ট্যাঞ্জিবল্ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় তার অ-প্রবৃত্তি একজন শভিনিস্টের অবস্থানকেই প্রমাণ করে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এবার ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের লিঙ্গ বৈষম্য সমস্যায় পুরুষের স্থান সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা দরকার। প্রথমেই যে বলেছিলাম, সমাজের শ্রেণীগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বন্টনের ভিত্তিতে দেখতে যাওয়া পোস্টমডার্ন সমাজে মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি অভ্যন্তরীণ অক্ষমতা — এক্ষেত্রে লিঙ্গ সমস্যাকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হল আমরা মনে করি নারীবাদ পশ্চিম থেকে আগত একটি ধারণা। ধূর্জটিপ্রসাদ যেমন একবার লিখেছিলেন, 'এই বিদেশী ধারণা অব সেক্স ইকোয়ালিটি পারিবারিক অসুখের একটা মূল কারণ।...' ধূর্জটিবাবুর এহেন বক্তব্য কোন প্রেজুডিস থেকে তৈরি হয়েছিল তা তিনিই জানেন তবে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি মহীরূহদের কথা ওনার জানা ছিল না। এছাড়া মল্লিকা সেনগুপ্তর কথায়: '... প্রকাশ্য তর্কসভায় পণ্ডিতি কূটতর্করত গার্গী বা মৈত্রেয়ীর কথা আমরা জানি। ...যে মেয়েরা বৈদিক শ্লোক রচনা করেছিল তাঁদের নাম মুছে গেছে। ...অন্ধকার মধ্যযুগে যখন পুরুষতন্ত্রের বোলবোলাও চরমে, তখন মীরাবাই বা আক্কা মহাদেবীর প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়েও।...' কাজেই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নারীবাদ মোটেই পশ্চিম থেকে আগত কোনো ধারণা নয়।

আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মূলধারায় পুরুষতন্ত্রের বিবর্তনও সমানভাবে ঐতিহাসিক। ইন্ডিয়ান মাসকুলিনিটি বা ভারতীয় পৌরুষের সংজ্ঞার উদ্ভব পুরাণ সাহিত্যের হাত ধরে। একটু ভাবলেই পাঠক টের পাবেন কামসূত্র, মনুস্মৃতি, মৃচ্ছকটিকা কিংবা কালীদাস রচিত শকুন্তলা বা কুমারসম্ভব পুরুষের বস্তুগত শারীরিকতাকে সামাজিক অগ্রগতির ভরবিন্দু হিসাবে তোল্লাই দিয়ে এসেছে।

এরপর আক্রমণকারী সুলতানেট ও মুঘল সম্রাটদের ধার্মিক পটভূমির প্রভাবে নারী পুরুষ বিভাজনের গাঁথনি আরো পোক্ত হয়। ফলত নারী শরীর ফরবিডেন ফ্রুট হয়ে ওঠে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া দেবদাসীর মতো প্রথা ফিরে আসার সুযোগ পায়। এরপর বিষফোঁড়া ব্রিটিশরাজ — পশ্চিম থেকে ভারতে যদি কিছু এসে থাকে তাকে নীতা খুরানা বলেছেন, 'কলোনিয়াল র‍্যাশনাল অফ মাসকুলিনিটি'। অর্থাৎ ককেশিয়ানদের তুলনায় গায়ে গতরে খর্বকায় ভারতীয়দের ব্রিটিশরা কম পুরুষালি মনে করত এবং সেই ধারণা তারা ভারতবাসীর মাথায় হ্যামার করে দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের শতাব্দীগুলিতে স্বদেশী নেতারত্রাও সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যান — এমনকি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের ভাবনাগুলিকে মেয়েলি বলে উড়িয়ে দিতেও দেখা গেছে বহু জায়গায়। গান্ধীর ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিক স্তরে তিনি যতই মহিলাদের রাজনৈতিক কাজে যোগদানের হয়ে সওয়াল করে থাকুন, মূল ক্ষমতাচক্রে তাদের অংশগ্রহণের কথা তিনি কোথাও বলেনি নি।

কাজেই আধুনিক ভারতীয় পুরুষতন্ত্রে ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম ক্রিমের যতটা অনুদান ঠিক ততটাই দায়িত্ব 'করবা চউত' বা গান্ধীর মতো নেতাদেরও নিতে হবে। রাসেল ডিসকোর্সের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই এত বছরের বিভাজন নীতি আমাদের মানসে পুরুষের সারীরিক ধারণাকে এমনভাবে ইংগ্রেইন করেছে যে আমরা সামাজিক স্তরে একটি ফলস্ কনশাসনেসে বসবাস করছি আজও। সে কারণে রাজনৈতিক স্তরে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েও বাড়ি ফিরে এসেও আমাদের মনে হয় না যে সেই বিবাজন নিজেদের শোবার ঘরে দশকের পর দশক ধরে আমরা নিজেরাই চালিয়ে আসছি। হায় রে সভ্যতা!

এই ফলস্ কনশাসনেসই নির্ধারণ করে কোন কাজটি পুরুষালি কোনটি মেয়েলি বা পড়াশেনায় কোন বিষয়টি ছেলেদের জন্য বা কোনটি মেয়েদের। সে কারণেই বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্লাসে আমার পাশে বসা বান্ধবীটি আকর্ষণীয় হলেও আমাদের প্রেজুডিসে বসে থাকা ফলস্ কনশাসনেস্ সে কথা বিশ্বাস করতে দেয় না, সুন্দরী দেখার ভিড় আজও বাংলা বা সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসের জানলাতেই উপচে পড়ে। আরো মজার কথা, ফলস্ কনশাসনেসের জগতে যে কেবল পুরুষ বসবাস করছেন তা নয়, মহিলারাও সমান দোষে দোষী। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে রান্না-গৃহকর্মে ত্রুটি, 'স্বামীর' অবাধ্য হওয়া ইত্যাদির ফলে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়াকে বহু ভারতীয় মহিলা নিজেই সমর্থন করেন। এ বিষয়ে সবথেকে এগিয়ে তেলেঙ্গানা, তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক। পশ্চিমবঙ্গ এই লিস্টে খানিকটা পিছিয়ে আছে ঠিকই, তবে আমরা যে এই লিস্টে এখনও রয়েছি সেটাই যথেষ্ট লজ্জার কথা।

এখন প্রশ্ন হল আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় পুরুষদের কি করণীয়। শুরুতেই যা করণীয় তা হল লিঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় এই ফলস্ কনশাসনেস্জনিত সমস্যাটির অস্তিত্বকে কবুল করে নেওয়া। এরপর সামাজিক আঙিনায় যে যুক্তির পক্ষে আমরা টেবিল চাপড়ে প্রতিপক্ষের কোমর চুরমার করে দিচ্ছি, একই যুক্তি নিজেদের বসার ঘরে আমরা খাটাতে পারছি কিনা সেটুকু খেয়াল করলেই বাকি কাজ তামাম। আলোচনার শুরুতে যে হাইপোথেটিকাল প্রশ্নের কথাটি তুলেছিলাম সেটায় ফিরে গেলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে রোজকারের জীবনে খাবারের থালা থেকেই সাম্যবাদের জেনেসিস। আমার আপনার বাড়ির শোবার ঘরে কতটা সাম্যবাদ আমি-আপনি বজায় রাখতে পারছি তার উপর গোটা সমাজের সাম্য নির্ভর করছে। রাজনৈতিক জগত মধ্যবিত্তের সংসারের বাইরে নয়, বরং রান্নাঘর থেকেই রাজনীতির জন্ম হয়েছে। পুরুষ পাঠকদের বলছি, ডান-বাম মতাদর্শ নির্বিশেষে আসুন না 'ঘরোয়া' ব্যাপার নিয়ে আরেকটু বেশি মাথা ঘামাই। যে রীতি-রেওয়াজকে স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত আওতায় লিঙ্গ বৈষম্যের জুলুম চালিয়ে আসছে মাছে-ভাতে বাঙালি পুরুষ সেই মৌলিক নিয়মকে প্রশ্ন করার সময় এসেছে। তাতে আমার আপনার ঘরের সৌন্দর্য যতটা বাড়বে, ততটাই স্থিতিশীল হবে বারান্দায় ব্যাট-বল হাতে স্বপ্ন দেখা খুদে ভবিষ্যতরা— তারা যা দেখে বড় হবে সেটাই তো তাদের ফিউচার কালেকটিভ কনশাসনেস তাই না? আজকের পোস্টমডার্ন সোস্যল-নেটওয়ার্কের ভারতবর্ষে আবার ভাইরাল হোক — 'The personal is political.'

উমা

ক্লোনড্ পত্রিকা : সাম্প্রতিক সমস্যা ও সমাধানের পথ

মোনালিসা মুস্তাফি

৩ জুলাই, ২০২০ একটি বহুল প্রচারিত ইংরেজি দৈনিকে একটি খবর প্রকাশিত হয়, যা উচ্চশিক্ষা বা গবেষণার মানকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। খবরটি হল— টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন 'ক্লোন' পত্রিকায় গবেষণাপত্র ছাপিয়ে বিপদের মুখে বহু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। খবরটি যে শুধুমাত্র শিক্ষা বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে, তা নয় বরং সাধারণ মানুষের মনে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। তিনটি প্রশ্ন সামনে আসে। ১। ক্লোন জার্নাল বা পত্রিকা বলতে আমরা কী বুঝি? ২। কেন এই ক্লোন জার্নালগুলির এত বাড়বাড়ন্ত? ৩। কীভাবে এটি আটকানো সম্ভব?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গেলে বলা যায় যে 'ক্লোন' কথাটির বাংলা তর্জমা হল কোনো বস্তুর অভিন্ন অনুলিপি। ক্লোন পত্রিকা বা জার্নাল হল একটি প্রকৃত পত্রিকার নকল প্রতিরূপ যা বৈধ পত্রিকাটির শিরোনাম, আই এস এস এন নম্বর। পত্রিকার যাবতীয় সনাক্তকারী চিহ্নের ব্যবহার করে সমরূপ এক নকল পত্রিকা। অনেক সময় সম্পাদকমণ্ডলী, প্রকাশনা সংস্থার নাম বা প্রকৃত পত্রিকাটির ওয়েবসাইট ইউ আর এল-এ সামান্য পরিবর্তন ঘটানো হয় আইনি জটিলতা কাটানোর জন্য। পরিবর্তন করা হয় চতুরভাবে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

এবার আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে, কেন এই নকল পত্র-পত্রিকাগুলির চাহিদা বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে, এবং কেনই বা মানুষ এই দুষ্টচক্রে সামিল হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউ জি সি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৫৬ সালে স্থাপিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ইউ জি সি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দেয় এবং তাদের মধ্যে সংহতি স্থাপন ও মান নির্ণয় করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পড়ানোর প্রবেশিকা এবং পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দের পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট নম্বর যার একটি বিশাল অংশ অর্জন করতে হয় বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় গবেষণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে। ইউ জি সি ২৮ নভেম্বর, ২০১৮-তে Consortium for Academic & Research Ethics (CARE) স্থাপন করে যার উদ্দেশ্য হল উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন গবেষণা, অ্যাকাডেমিক সততা রক্ষা এবং প্রকাশনার নৈতিকতাকে বজায় রাখা। ইউ জি সি কেয়ার-এর অন্তর্ভুক্ত হয় দুটি তালিকা, যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মান যাচাই করে তাদের এই তালিকাগুলির অন্তর্ভুক্ত করে। যে পত্র-পত্রিকাগুলি ইউ জি সি কেয়ারের প্রোটোকল অনুসারে উচ্চমানের বলে বিবেচিত হয়, তাদের ইউ জি সি কেয়ার তালিকা ১-এ স্থান দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত (ইনডেক্সড্) ডাটাবেসের উপর সূচিবদ্ধ জার্নালগুলি ইউ জি সি কেয়ারের তালিকা ২-তে স্থান পেয়েছে। বর্তমানে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের চাকরির প্রবেশিকার ক্ষেত্রে এবং পদোন্নতির জন্য ইউ জি সি কেয়ার তালিকাভুক্ত পত্র-পত্রিকায় গবেষণাপত্র প্রকাশ বাধ্যতামূলক। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যে পত্র-পত্রিকাগুলি ইউ জি সি কেয়ারভুক্ত হয়, তা অত্যন্ত উচ্চমানের এবং নির্ভরযোগ্য। কেয়ার তালিকাভুক্ত পত্র-পত্রিকায় গবেষণাপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রে অনেক সময়ই গবেষণাপত্রের মান এবং সময় এই দুটি বিষয় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কেয়ার তালিকাভুক্ত পত্র-পত্রিকায় লেখা নির্বাচিত হতে গেলে গবেষণা পত্রটির মান খুবই সূক্ষ্মভাবে যাচাই করা হয়। যে তথ্যগুলি লেখায় প্রকাশ হয়েছে, তার সত্যতা যাচাই করে এবং সেই পত্রটির গুরুত্ব যাচাই করে তবেই তাকে নির্বাচিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, কারণ নির্দিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলী বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা যাচাই করার পরেই তা গৃহীত হয়। অন্যদিকে ক্লোন জার্নালের ক্ষেত্রে গুণগত মানের মাপকাঠি একরকম অনুপস্থিত এবং খুব তাড়াতাড়ি এগুলি প্রকাশের অঙ্গীকার করা হয়। ক্লোন পত্রিকাগুলির বাড়বানন্তের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় যে মানুষ দু-ভাবে এই দুষ্টচক্রের ফাঁদে পা দিচ্ছে। প্রথমত সজ্ঞানে, দ্বিতীয়ত অজান্তে। টাকার বিনিময়ে গুণগত মান বিচার ছাড়াই খুব দ্রুত ছাপানোর অঙ্গীকার করে এই ক্লোন পত্রিকাগুলি। লেখা জমা দেওয়ার এক বা দুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটির সম্পূর্ণ পিডিএফ ভার্সান এবং মোটামুটি

একমাসের মধ্যেই হার্ড কপি পৌঁছে যায় লেখক লেখিকাদের কাছে। টাকার অঙ্কটি এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হয়। অনেক সময় গবেষকরা বুঝতেও পারেন না যে তিনি কেয়ার তালিকাভুক্ত কোনো পত্রিকায় তার লেখা ছাপাচ্ছেন না, সেই পত্রিকার নকল অনুলিপিতে ছাপাচ্ছেন, যা পরবর্তীকালে তার পদোন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমা, নির্দিষ্ট নম্বর, এই যাঁতাকলে পড়ে অনেকেই নিজেদের অজান্তে এই দুষ্টচক্রের ফাঁদে পড়ছেন। অনেকেই প্রকৃত কেয়ারভুক্ত জার্নাল আর ক্লোন জার্নালের পার্থক্য বুঝতে পারেন না। একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ক্লোন পত্রিকায় লেখা ছাপিয়ে প্রতারিত হওয়ার সংখ্যাটি ক্রমবর্ধমান এবং এর সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণটিও বেড়েই চলেছে।

কীভাবে এই প্রতারণার হাত থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করব বা সতর্ক হব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় International Standard Serial Number (ISSN), ৮ সংখ্যার কোড, যা একটি পত্রিকার পরিচিতি বহন করে। একই শিরোনামে একাধিক পত্রিকা থাকলে তাদেরকে আমরা তাদের নির্দিষ্ট ISSN নম্বর দিয়ে চিনে নিতে পারি। ISBN নম্বর বই-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। ক্লোন পত্রিকাগুলি আসল পত্রিকাটির ISSN নম্বর, তার আবরণ পৃষ্ঠার হুবহু নকল করে। তাদের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট, যোগাযোগের নম্বর, সম্পাদকমণ্ডলীর নাম সবই থাকে। অনেক সময়েই বোঝা অসম্ভব হয় যে নকল পত্রিকায় লেখা ছাপানো হচ্ছে। অত্যন্ত সুচারুভাবে এই পত্র-পত্রিকাগুলি আইনি জটিলতা কাটাতে পত্রিকার নাম বা প্রকাশনা সংস্থার নামের আগে বা পরে কোনো একটি অক্ষর বা শব্দ যোগ করে দেয়, যা এতটাই সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করে যা মানুষের অগোচরেই থেকে যায়। **একটি ইনডেক্সড্ পত্রিকায় গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে গেলে গবেষণাপত্রের মান যেভাবে যাচাই করা হয়, ক্লোন পত্রিকার ক্ষেত্রে সেসব ঝামেলা না থাকায় কিছু টাকার বিনিময়ে তা সহজলভ্য।** তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্লোন পত্রিকাগুলি মূল পত্রিকার ডোমেইনও ব্যবহার করে। এই সংস্থাগুলি Web Swapping থেকে শুরু করে মানুষকে আর্থিক প্রতারণার করে তার নিজস্ব ছন্দে। আরো হতচকিত করে দেওয়ার মতো খবর যে শুধু সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান বা ভাষা সাহিত্যের পত্রিকাগুলিই নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাও ক্লোনড্ হচ্ছে যা ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণাপত্রের বৈধতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আজ প্রশ্নের মুখে।

ক্লোন পত্রিকাগুলির বাড়বাড়ন্ত রুখতে ইউ জি সি তাদের ওয়েবসাইটে ক্লোন পত্রিকাগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকা নির্দিষ্ট সময়ে আপডেট করা হয়। কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকলেই এই দুষ্ট চক্রের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি। পত্রপত্রিকায় লেখা ছাপানো বা সাইটেশন-এর কাজে পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের আগে অবশ্যই কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। ক) সবসময় খুব সূক্ষ্মভাবে পত্রিকাটির ওয়েবসাইটি দেখতে হবে। খ) পত্রিকার ইনডেক্সিং ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। গ)যোগাযোগের নম্বরকে ভালো করে যাচাই করতে হবে। ঘ) সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে হবে। ঙ) পত্রিকাটির বিগত সংখ্যাগুলি পড়ে নিতে হবে। চ) পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়া এবং প্রকাশের সময় সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ছ) বিশাল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে গবেষণপত্র ছাপানোর অঙ্গীকার যে পত্র-পত্রিকাগুলি করে তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

শিক্ষা বিষয়ক দুর্নীতিকে স্বেচ্ছায় বা অজান্তে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ইচ্ছেশক্তির দ্বারা এরকম দুষ্টচক্র যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করছে তা আটকাতে হবে। সচেতনতা, সাবধানতা, সংযম দ্বারা আমাদের পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে এ ধরনের অন্যায়ের সঠিক বিচার ও প্রতিকার করা প্রয়োজন। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এই প্রকার দুষ্ট চক্রের বিরুদ্ধে সরব ও সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি।

তথ্যসূত্র :

১। সারফারাজ আহমেদ, ইউ জিসি লিস্টস ২৪ ক্লোন জার্নালস্ টিচারস্ টেকেন ফর রাইড, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩ জুলাই ২০২০।

২। ঋত্বিক শর্মা, মিনেস্ অফ প্রিডেটরি, ক্লোনড্ জার্নালস্ মোর রেমপান্ট ইন পোস্ট প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ড, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৪ নভেম্বর ২০২১।

উমা

চিঠি পত্র

বর্ধমানের সদাই ফকিরের পাঠশালাতে বছরে দু-টাকার বিনিময়ে শিক্ষার আলো দিয়ে যাচ্ছেন মাস্টারমশাই সুজিত চট্টোপাধ্যায়। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। নিজে শিক্ষিকা— তাই প্রথমে আনন্দে বুকটা ভরে উঠেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে অপরাধী মনে হল— মনে হল 'আমি পারিনি'। একটু তলিয়ে ভেবে বুঝলাম শুধু আমি নই— আমার মতো ঝাঁ চকচকে পাঁচতারা স্কুলে যাঁরা পড়ান, তাঁদের অধিকাংশই পারেননি, যাঁরা এই স্কুলগুলির শিখরে মধ্যমণি হয়ে প্রধানশিক্ষক বা প্রধানশিক্ষিকার পদ অলংকৃত করেছেন, তাঁরাও পারেননি। যাঁরা দিল্লির শিক্ষা পর্ষদের মসনদে বসে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ভবিষ্যৎ গড়ছেন, ভাবছেন— তাঁরাও পারেননি।

করোনার প্রকোপে পুরো শিক্ষাব্যবস্থাটাই বদলে গেল—জীবন এবং জীবনদর্শন তো বটেই। সবকিছু অনলাইন হয়ে গেল। শান্তভাবে চুপিচুপি এসে কিছু চোখে না দেখতে পাওয়া জীবাণু সারা পৃথিবীকে যে কোনো ভয়াবহ দুর্যোগের থেকে অনেক বেশি মাত্রায় কাঁপিয়ে দিল। মানুষ লড়তে জানে, তাই প্রথমে পারার কথা বলাই বাহুল্য। এই মহামারীর সাথে চলার অভ্যাস করল মানুষ। জীবন তো স্বাভাবিক হল না, সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও চালু হল নতুন কথা 'নিউ নর্মাল'। বড় বড় নামি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বলা হল অনলাইন পড়াতে হবে— নতুন শিক্ষার পাঠ্যক্রম শুরু হল আমাদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার আদানপ্রদান। এঁদের মধ্যে অনেকের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিনে ফেললেন আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকারাও কিনলাম। করোনা ভেদাভেদ বাড়াল— গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা বাদ পড়ল।

মাস্টারমশাই সুজিতবাবুর ব্যাপারে ওই ছোট খবরটি একটা বড় উপলব্ধির সামনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে। এতক্ষণ যা কিছু বলছিলাম— তা সব 'পেরেছি'র মধ্যে পড়ে। নিশ্চয়ই আনন্দের কথা যে আমাদের মতো পুরনোপন্থী শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের আধুনিক প্রযুক্তিতে পারদর্শী করে তুলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। তবুও কোথায় যেন একটা হারিয়ে যাওয়া—হেরে যাওয়ার ব্যথা পেলাম।

খবরের কাগজের ছবিতে বয়স্ক মানুষটি সাধারণ ফতুয়া আর অনেক ব্যবহারে বিবর্ণ লুঙ্গি পরে বাড়ির দাওয়ায় মোড়ায় বসে রয়েছেন, কোলের ওপরে খোলা বই। ছবি তোলা হচ্ছে সেদিকে নজর নেই। বাড়ির দাওয়াটি ছবি তোলার জন্য পরিপাটি করে সাজানো হয় নি। এই চিত্রের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করলাম নিজেকে। অনলাইন পড়ানোর জন্য নিজেকে এবং ঘরটিকে পরিপাটি করে সাজিয়ে বসতে হয় কম্পিউটারের সামনে কারণ ছাত্র-ছাত্রী তো বটেই, তাদের বাবা-মায়েরাও দেখবেন। অনলাইন ক্লাসের সময় আমাদের অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা ভিডিও অফ করে অন্যদিকে মন দেয়, ক্লাস ছেড়ে চলেও যায়, কেউ কেউ মোবাইল নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে বা খেলতে ব্যস্ত, কিছুই শুনছে না। কিছু ক্ষেত্রে বুঝতে পারি বাড়ির বড় কেউ পাশ থেকে পড়া শুনছেন — পড়ানো ঠিকমতো হচ্ছে তো? শিক্ষক/শিক্ষিকা ঠিকমতো কাজ করছেন তো? স্কুলের এত মাইনে! এত খরচ! ইত্যাদি। ঠিকই তো। ব্যবসায় ক্ষতি হলে চলবে কেন? শ্রদ্ধা দুর্লভ; বিশ্বাস ভরসা এসব আমাদের মতো পাঁচতারা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশা করা অনুচিত। এগুলো বর্ধমানের আউসগ্রামের ওই মাস্টারমশাইয়ের মতো অর্জন করতে পারি নি। এই ছোট্ট গ্রামটি কলকাতা থেকে কেবল তিন ঘণ্টা দূরে, অথচ ওই মাস্টারমশাই-এর আর কলকাতার বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবনদর্শনের দূরত্ব অপরিমেয়।

যুগ বদলেছে। সাফল্যের সংজ্ঞাও বদলেছে। আজকাল প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে একে অপরকে লিখি 'হ্যাপি রিপাবলিক ডে'। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের সংবিধান নিয়ে গত প্রজাতন্ত্র দিবসে যে আলোচনা করেছিল তা থেকে বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভাবনা বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ। তবুও মনে হচ্ছিল যে, এগুলো ওদের মনের কথা নয়। এর আগেও পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বাঁচানোর স্বার্থে যে ছাত্রীরা আমার সাথে প্রাণ ঢেলে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিল আজ তারা প্রত্যেকেই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে ব্যস্ত— দেশের জন্য ভাবার সময় নেই। এটাই স্বাভাবিক, এটাই জীবন।

সবই বুঝি, হয়তো হৃদয় দিয়ে বুঝি। তাই ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে ছাত্রীদের বলিষ্ঠ বক্তব্য আমাকে নাড়া দেয়নি। আজকাল কলকাতার সব নামি স্কুলগুলির নাম, স্কুল যাঁরা চালান তাঁদের বক্তব্য বহুবার নামকরা খবরের কাগজের শিরোনামে দেখা যায়। সব স্কুলগুলি একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে ব্যস্ত। কতগুলি অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেওয়া হল,স্কুলের সব সাফল্যের খবর— সব ভাল ঘটনা, জেতার ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে 'পারিনি' কোথায়?

এই 'পারিনি'র গল্প সোস্যাল মিডিয়াতে, খবরের কাগজে বা স্কুলের আনাচে কানাচে কোথাও পাবেন না, সব জায়গার ছবিগুলি শুধুই সাফল্যের। এই 'পারিনি' কিছু পুরাতনপন্থী শিক্ষক-শিক্ষিকার মনের গভীরে পাবেন — প্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো। প্রতি বছরের মতো এ বছরেও ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক নম্বর পেয়ে পাশ করল দশম ও দ্বাদশ শ্রেণী। করোনার জন্য বাড়িতে বসেই পরীক্ষা দিতে হল। তবে অনেক নম্বর পেয়ে যেসব ছাত্র-ছাত্রী তৈরি হচ্ছে, তারা ক-জন সত্যিকারের মানুষ হল? সকলের সাথে চলা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, সততার জন্য নির্ভীকভাবে উঠে দাঁড়ানো, সাধারণের জন্য নিজের কিছু সুবিধা ছাড়তে পারা, সত্যিকারের সংবেদনশীল মানুষ হওয়া— এসব সাধারণ গুণাবলী আজকাল দুর্লভ। আমার কষ্ট হয় এত খরচ করে শহরের নামি বড় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মা-বাবার স্বপ্নের, স্কুলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার আর দেশের শিক্ষা পর্ষদের বিদেশ থেকে না বুঝে টুকলি করা শিক্ষা পদ্ধতির চাপে কাগজে-কলমেই শুধু মানুষ হচ্ছে। আসলে আমরা অত্যাধুনিক যুগের জন্য রোবট তৈরি করছি— প্রাণহীন, অনুভূতিহীন, শৈশবহীন রোবট—যারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরো 'উন্নত' করবে— আরো বাড়াবে ধনী-গরীবের ফারাক! তাতেই দেশের উন্নতি— দেশের মুষ্টিমেয় উপরতলার মানুষের উন্নতি। যে হাজার হাজার অচেনা মুখ— যারা এই দেশের নাগরিক, যাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী সমান অধিকার প্রাপ্য, যাদের শ্রমের উপরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার টিকে থাকা নির্ভর করে, অথচ যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তারা সেই অন্ধকারেই পড়ে থাকছে, পড়ে থাকবে। কারণ তাদের আলোয় আনতে পারার জন্য যে মানুষের প্রয়োজন, মানুষ গড়ার কারখানায় তা আমরা তৈরি করতে পারি নি। এত বছর পরেও সত্যিকারের শিক্ষিকা হয়ে উঠতে পারি নি।

ড. সুদেষ্ণা ঘোষ
কালীঘাট। কলকাতা - ৭০০০২৬

উমা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00

৪২ বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২২ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/
৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ---হারিত বুকস (অনলাইন)
haritbooks@gmail.com
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়।
Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0008320

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১০০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক:	
রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা, দুপুর ৩টে-সন্ধ্যে ৭টা), পাতিরাম, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন।